দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

website : www.eswastika.com

৭৫ বর্ষ, ৯ সংখ্যা।। ৩১ অক্টোবর, ২০২২।। ১৩ কার্তিক - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪

প্রয়াত কেশবরাও দীক্ষিত ও শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ১৩ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

৩১ অক্টোবর - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

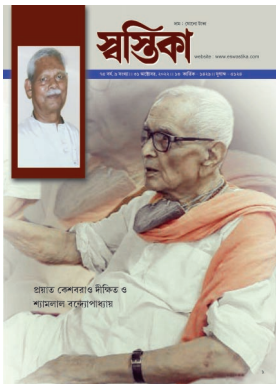

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

পৌষে সর্বনাশ, তাই মরা সাপ জাগাতে ফুঁ দিচ্ছেন মমতা
☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

রাজ্য এখন হত্যাপুরী, নিরাপত্তার খোঁজে সাধারণ মানুষ
☐ বিশ্বপ্রিয় দাস ☐ ৭

প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ছক বড়োই অশুভ ☐ মণীন্দ্রনাথ সাহা ☐ ৮

বাংলাদেশের অগ্রগতির জন্য ভারতকে পাশে প্রয়োজন
☐ শিতাংশু গুহ ☐ ১০

নরেন্দ্র মোদীকে ক্ষমতাচ্যুত করতে আন্তর্জাতিক চক্র সক্রিয়
☐ আনন্দ মোহন দাস ☐ ১১

কেশবজী স্বয়ংসেবক পরিবারের পরমাত্মীয় ছিলেন
☐ সুশান্ত রঞ্জন পাল ☐ ১৩

কীর্তিঃ যস্য স জীবতি ☐ রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ১৪

দিব্য দেহধারী কেশবরাও দীক্ষিত ☐ বিধান চন্দ্র আখুলি ☐ ১৫

স্মরণে-মননে শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ বিমলকৃষ্ণ দাস ☐ ১৮

পরিচ্ছন্ন মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
☐ কল্যাণ গৌতম ☐ ২০

বঙ্গভূমিতে সারাটি জীবন কাটিয়ে গেলেন কেশবজী
☐ প্রদীপ ঘোষ ☐ ২৩

কেশবজীর উপস্থিতি আমাদের হৃদয়ে সদা জাগ্রত
☐ তিলক রঞ্জন বেরা ☐ ২৫

আমাদের কেশবজী ☐ বিজয় আঢ্য ☐ ২৬

কেশবজী সদা স্বয়ংসেবকদের মনের মণিকোঠায় বিরাজ করবেন
☐ শম্ভুনাথ ধাড়া ☐ ২৮

প্রণম্য পুরুষ কেশবরাও দীক্ষিত ☐ মহাবীর বাজাজ ☐ ৩১

আমার স্মৃতিতে কেশবজী হিসেবেই তিনি বাঙ্গলার স্বয়ংসেবকদের মনে স্থান করে নিয়েছেন
☐ শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা ☐ ৩৪

বাঙ্গলায় সঙ্ঘকাজের সূত্রধর কেশবজী
☐ বিজয় কুলকার্ণী ☐ ৩৫

কেশবজী চিরকাল স্বয়ংসেবকদের হৃদয়ে চিরবিরাজমান থাকবেন ☐ মন্দার গোস্বামী ☐ ৩৭

আমার স্মৃতিতে কেশবজী ও শ্যামলালদা ☐ প্রবীর মিত্র ☐ ৩৯

বাঙ্গলার সঙ্ঘ-ভগীরথ কেশবজী আর নেই
☐ ধীরেন দেবনাথ ☐ ৩৯

বাহাত্তর বছর বঙ্গে কেশবজীর বাস না প্রবাস
☐ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ☐ ৪০

শ্যামলালদাকে যেমন দেখেছি ☐ অতুল কুমার বিশ্বাস ☐ ৪৩

নব ভারতের দধীচি ☐ ইন্দ্রমোহন রাভা ☐ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৮ ☐ **চিত্রকথা : ৫০**

প্রকাশিত হবে ৭ নভেম্বর ২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৭ নভেম্বর ২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মোদীকে হটাতে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র

কিছুদিন আগেকার ঘটনা। কানাডায় খালিস্তানপন্থীদের সাধারণ সভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুণ্ডুপাত করা হলো। অথচ জাস্টিন ট্রুডোর সরকার টুঁ শব্দটি করল না। ব্রিটেনের লিজ ট্রস সরকার ভারতের সঙ্গে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট বাতিল করল কোন যুক্তিতে? এগ্রিমেন্ট হলে নাকি প্রচুর ভারতীয় ব্রিটেনে আসবেন এবং ভিসার মেয়াদ শেষ হলেও দেশে ফিরবেন না। এর পাশাপাশি আছে হঠাৎ পাকিস্তানের প্রতি আমেরিকার দরাজ হয়ে ওঠা। এসবই ভারতের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করার কৌশল। বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদীকে ক্ষমতাচ্যুত করার ছক। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় এটাই। লিখবেন ড. রাজলক্ষ্মী বসু, ভবানীশঙ্কর বাগচী প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

With Best Compliments from :-

A

Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মৃত্যুহীন নশ্বরতা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ শুধু ভারতবর্ষেই নহে, সমগ্র পৃথিবীতে একটি বহু আলোচিত নাম। সকলেই স্বীকার করিবেন যে সঙ্ঘ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমগ্র বিশ্বে সঙ্ঘ সবচাইতে সুশৃঙ্খল এবং সর্ববৃহৎ সংগঠন। শুধু তাহাই নহে, জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সঙ্ঘের কর্তৃত্ববান স্বয়ংসেবকরা সুদৃঢ় সংগঠন গড়িয়া তুলিয়া জাতীয়তাবোধের আবহ সৃষ্টি করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় বিপত্তির সময়ে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা তাহার নিরাকরণের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া থাকেন। কয়েক হাজার প্রচারক লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবকের সহযোগিতায় দেশের কোটি কোটি মানুষের মনে দেশপ্রেমের ভাব সুদৃঢ় ও গভীরতর করিবার কাজে নিয়োজিত রহিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক যোজনা এক অভিনব পদ্ধতি। এই প্রচারকরাই সমাজের মানুষের সহযোগিতায় সমগ্র দেশে সঙ্ঘকার্যের বিস্তার ঘটাইয়াছেন। নিজের প্রথাগত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, পিতা-মাতার অনুমতি লইয়া, ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত অর্থোপার্জনের চেষ্টা না করিয়া, শুধুমাত্র সঙ্ঘকার্যের জন্যই যাঁহারা জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন তাহাদিগকে প্রচারক বলা হয়। প্রচারকরা দেশের মানুষের শরীরে ও মনে শৃঙ্খলা আনিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে পরিপুষ্ট হইয়া সমাজজীবনে দেশ, জাতি, ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি আপনত্ব বোধ নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। দেশকে মাতৃভূমি জ্ঞান করিয়া দেশের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের নিমিত্ত দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। প্রদেশ, ভাষা ও গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে উঠিয়া হিন্দু সমাজের ঐক্যসাধনে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন। সমাজ জীবনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, সমাজকে কল্যাণ কর্মে উদ্বুদ্ধ করেন এবং সমাজের উপর আঘাত উপস্থিত হইলে সমাজের মানুষকে সঙ্গে লইয়া সাহসের সহিত তাহার প্রতিরোধ করেন। সমাজ জীবনে এই প্রচারকরা আলাদা কোনোপ্রকার পরিচিতি আশা করেন না। সমাজের মধ্যেই তাহারা একীভূত হইয়া সমাজ সংগঠনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করিয়া থাকেন। সঙ্ঘ মহারাষ্ট্র প্রদেশে শুরু হওয়ার কারণে প্রথমদিকে মারাঠি স্বয়ংসেবকরাই প্রচারক রূপে সমগ্র দেশে সঙ্ঘকাজের বিস্তার ঘটাইয়াছেন।

মহারাষ্ট্র হইতে বেশ কয়েকজন প্রচারক এই বঙ্গপ্রদেশে আসিয়াছিলেন। সঙ্ঘকার্যের অগ্রগতি ঘটাইয়া তাহারা স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনও করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্যতিক্রম হইলেন মহারাষ্ট্র হইতে আগত উচ্চশিক্ষিত যুবক কেশবরাও দীক্ষিত। বঙ্গপ্রদেশের স্বয়ংসেবকদের নিকট তিনি কেশবজী নামেই পরিচিত। সঙ্ঘকাজ করিতে করিতে তিনি বঙ্গভূমিতে একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন। বঙ্গভূমিও তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। বাহাত্তরটি বৎসর এই বঙ্গভূমিতে অতিবাহিত করিয়া কিছুদিন পূর্বে তিনি ইহলোকের যাত্রা সমাপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে বঙ্গপ্রদেশের স্বয়ংসেবকরা তাহাদের অভিভাবক তথা একান্ত আপনজনের বিয়োগ ব্যথা অনুভব করিয়াছে। এইকথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে কেশবজীই বঙ্গভূমিতে সঙ্ঘকার্য দৃঢ়ীকরণের মূল কারিগর। তাঁহার সুযোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্বে সঙ্ঘ আজ বঙ্গভূমির গভীরে মূল প্রোথিত করিয়াছে। তাঁর প্রেরণায় অসংখ্য যুবক শুধু সঙ্ঘকার্যে যুক্তই হন নাই, বহু উচ্চশিক্ষিত যুবক প্রচারক ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় বিবিধক্ষেত্রে বহু সংগঠন সৃষ্টি হইয়াছে এবং সমাজের বহু মানুষ তাহাতে যুক্ত হইয়াছেন। বর্তমান প্রজন্মের স্বয়ংসেবকদের নিকট তিনি প্রকৃত অর্থেই পিতামহস্বরূপ। তাঁহারই প্রেরণায় কলকাতার উচ্চশিক্ষিত যুবক শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারক জীবনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেশবজীর প্রয়াণের তিনদিন পর তিনিও অমৃতলোকে গমন করিয়াছেন। ১৯৬০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম কম পাশ করিয়া দক্ষিণ কলকাতা, বীরভূম, নদীয়া ও উত্তরবঙ্গে প্রচারক জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। দীর্ঘ প্রচারক জীবনে তিনিও শত শত যুবকের মনে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালাইয়াছেন। কেশবরাও দীক্ষিত ও শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আজ পার্থিব শরীরে আমাদের মধ্যে নাই, তাহা সত্ত্বেও বঙ্গপ্রদেশের প্রতিটি স্বয়ংসেবকের মন-প্রাণ জুড়িয়া তাঁহারা চিরকাল বিরাজ করিবেন।

সুভাষিতম্

মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি ধনমিচ্ছন্তি পার্থিবাঃ।

নীচাঃ কলহমিচ্ছন্তি সন্ধিমিচ্ছন্তি সাধবঃ।।

মাছি শরীরের ক্ষত কামনা করে, সাধারণ মানুষ ধনসম্পদ কামনা করে, নীচ ব্যক্তি কলহ পছন্দ করে এবং সাধুপুরুষ শান্তিপূর্বক সহাবস্থানের ইচ্ছা কামনা করেন।

পৌষে সর্বনাশ, তাই মরা সাপ জাগাতে ফুঁ দিচ্ছেন মমতা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

প্রবাদ আছে, কমিউস্টরা ফিনিক্স পাখি। মরেও মরে না। 'অলসো কমিউনিস্টস ডু নট রিটায়ার'— তারা অবসরও নেয় না। আগামী বছর ৭৪ হাজার আসনের রাজ্য পঞ্চায়েত ভোট। তাই মরা সাপকে জাগাতে এখন থেকেই ফুঁ দিয়ে মন্ত্র পড়তে শুরু করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিঙ্গুরের জমির দখল নিয়ে টাটাবন্দনার পাশাপাশি সিপিএমকে গালমন্দ করা চালু করেছেন মমতা। হাস্যকরভাবে দাবি করছেন 'টাটাদের সিঙ্গুর থেকে তাড়িয়েছিল সিপিএম।' গ্রামের মানুষ যেন ভুলে না যান যে সিপিএম জমি লুটেরার দল। ইদানীং মমতার ভাষণে বোঝা যাচ্ছে সিপিএমের উত্থান নিয়ে তিনি বেশ খানিকটা ভয়ে রয়েছেন। তিনি শঙ্কিত যে সিপিএম আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। তাই তাদের বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষকে জিরো টলারেন্স দেখাতে বলছেন মমতা।

মমতা জানেন রাজনীতিকদের মানুষ বিশ্বাস করেন না। রাজ্য জুড়ে যে দুর্নীতির কারখানা তিনি চালু করেছেন তাতে তাঁর ভাবমূর্তি তলানিরও নীচে কিছু থাকলে তাতে এসে ঠেকেছে। তাই তাঁর কথা মানুষ শুনবে না। উলটোটাই করবে। তারা সিপিএমকে ভোট দেবে আর তাতে বিজেপির ভোট যতটা কমবে সিপিএম থেকে তার দিকে চলে আসা ভোটের সংখ্যা হয়তো ততটা কমবে না।

২০১৯-এর ভোটে বামেরা রাম হয়েছিলেন। আর ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে এক সিপিএম নেতার কথায় — 'ডাকাতকে (বিজেপি) আটকাতে চোরেদের (তৃণমূল) ভোট দিলাম।' এই রকম সমীকরণে দাঁড়িয়ে উত্তরবঙ্গের পাহাড় না দেখে তাই দক্ষিণবঙ্গের হুগলীর জমি দেখছেন মমতা। মমতার টার্গেট সিপিএম। রাজ্য বিধানসভার সিংহভাগ (১৫৬/২৯৪) গ্রামবাঙ্গলায়। ২০২১-এর ভোটে তার ৪৮ শতাংশ (১১৭ আসন) জেতেন মমতা। তা ধরে রাখতে বিজেপি নয়, সিপিএমকেই বড়ো শত্রু মনে করছেন মমতা। মূলকথা, সিপিএম থেকে বিজেপিতে চলে যাওয়া বাম-হিন্দু ভোট ফিরলে এক ঢিলে দুই পাখি মারবেন মমতা। তাতে সিপিএমের ভোট বাড়বে আর বিজেপির ভোট কমবে। বিধানসভা ভোটে সিপিএমের ২৫ আসন মমতা টেনে নেয়। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে বামেদের ৭ শতাংশ ভোট কমে ৪ শতাংশ হয়ে যায়। বিধানসভায় তারা শূন্য হয়ে যায়। লোকপ্রবাদ হলো কার্তিক,ভাদ্র আর পৌষমাসে কাউকে তাড়াতে নেই। তাতে সর্বনাশ হয়। এরাজ্যের জন্য তা একশো ভাগ সত্য। ২০০৬ সালের পৌষমাসে জাতীয় সড়কে টাটার ন্যানো কারখানার জমির বিরুদ্ধে টানা ২৬ দিন (৩ থেকে ২৮ ডিসেম্বর) অনশন করেন মমতা। দাবি ছিল, টাটাদের জন্য জমি লুট করেছে সিপিএম। তা ফেরাতে হবে। অবস্থা বেগতিক বুঝে ২০০৮ সালের ভাদ্রমাসে পাততাড়ি গুটিয়ে গুজরাট চলে যায় টাটারা। বারো বছর পর তারা ন্যানো প্রকল্প বন্ধ করে দেয় । ২০০৮ থেকে এরাজ্যে শিল্প-খরা শুরু হয়। রাজ্য পরিণত হয় শিল্পশ্মশানে। রাজ্যের পরিবেশে শিল্পপতিদের কোনো আস্থা নেই।

২০১৩ থেকে শিল্প সম্মেলন করে লগ্নির কুমির ছানা দেখাচ্ছেন মমতা। তাঁর বদান্যতায় তৈরি হয়েছে চপ-বেগুনির শিল্প। সামনেই পৌষমাস। অনেকে বলছেন তখন থেকেই নাকি শুরু হবে মমতার পতন। আর তার শেষ হবে ২০২৩-এর ভাদ্রে। অঙ্কটা আমি জানি না। শুনেছি ২০১৯-এর পৌষ থেকে আটকে থাকা নাগরিক আইন চালুর ছাড়পত্র ২০২২-এর পৌষে দেবে কেন্দ্র। কেউ বলছেল মমতা আর তার পরিবার বা দলের কয়েকজন ঘনিষ্ঠকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেপ্তার করতে পারে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। মোট কথা, পৌষমাসে মমতার সর্বনাশ যে প্রায় নিশ্চিত তা আশ্চর্যভাবে জেনে গিয়েছেন কিছু নেতা।

ঠাট্টা করে বলা হয়, না খেয়ে অনশন চালানো যায় না। তাই সিঙ্গুর হাইওয়ের ধারে নাকি খাবার খেয়ে অনশন চালিয়েছিলেন মমতা। তাঁকে হটানোর আইনি ছাড়পত্র থাকলেও একজন মহিলার প্রতি সৌজন্য দেখিয়ে তা প্রায়োগ করেননি সিপিএমের অতিভদ্র মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ২০১১-র ভোটে কুৎসিতভাবে হেরে গিয়ে তার খেসারত দেয় সিপিএম। তাঁর অতিভদ্র ব্যবহার যে দলের মরণ ডেকে আনবে তা বুঝতে পারেননি বুদ্ধদেববাবু। বন্ধু সাংবাদিকদের তিনি বলেছিলেন, ' একজন মহিলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমি পুলিশ পাঠাতে পারব না।' দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় স্বভাবসিদ্ধ রাজনৈতিক মায়াজাল ছড়াতে আবোল তাবোল আর অসত্য ভাষণ দিচ্ছেন মমতা। সে মায়াজালে মনে হয় ফাঁসবেন না এ রাজ্যের মানুষ। ফাঁসলে মানুষের ক্ষতি আর মমতার লাভ। □

রাজ্য এখন হত্যাপুরী, নিরাপত্তার খোঁজে সাধারণ মানুষ

বিশ্বপ্রিয় দাস

আমাদের রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে বারেবারেই প্রশ্ন ওঠে। তার কারণ অবশ্যই আছে। কেননা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই হচ্ছেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবার পুলিশমন্ত্রী। রাজ্যবাসীর নিরাপত্তার ষোলো আনা দায় বর্তায় মুখ্যমন্ত্রীর ওপরেই।

গত কয়েক মাস ধরে আমাদের রাজ্যে একের পর এক ঘটে যাওয়া ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি কতটা অবনতির দিকে এগোচ্ছে! সম্প্রতি জাতীয় ক্রাইম রিপোর্টের প্রকাশিত একটি সমীক্ষা নিয়ে বেশ সন্তুষ্ট ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। কিন্তু সেই রিপোর্ট যে কতটা ভুয়ো আর বেঠিক তা বোঝা যায় রাজ্যে ঘটে যাওয়া নানা সন্ত্রাসী ঘটনাবলীর ওপর চোখ রাখলে। সেইসব অপরাধের রাজনৈতিক চাপান-উতোর অথবা রাজনীতির রং লেগে গেলে সেই অপরাধ আর শাসনের খাতায় অপরাধ হিসেবে ঠাঁই পায় না। আর অপরাধীরা বিশেষ করে যাদের মাথায় রাজনৈতিক ছাতা ধরা আছে, সেইসব মাস্টার মাইন্ডরা আড়ালেই থেকে যায়।

রাজ্যে ঘটে যাওয়া কয়েকটি সাম্প্রতিক অপরাধের কথা বলা যাক। গত ৬ সেপ্টেম্বরের ঘটনা। বসিরহাটের মর্গে দুটি মৃতদেহের খোঁজ পাওয়া গেল। মালঞ্চ এলাকায় রাজ্য পুলিশ উদ্ধার করে অজ্ঞাতপরিচয় দুই কিশোরের মৃতদেহ। তখনও জানা ছিল না ওই মরদেহ দুটি অতনু আর অভিষেকের যারা বেশ কিছুদিন ধরে নিখোঁজ ছিল। নিরুদ্দেশের প্রায় ১৫ দিন পরে বাসন্তী হাইওয়ের পাশে তাদের দেহ পাওয়া যায়। এই অপরাধের পেছনে তাদের পড়শি সত্যেন্দ্র চৌধুরীর হাত রয়েছে বলে জানা গেছে। অতনু, অভিষেকের হত্যার কারণ হিসেবে অনেক তথ্য উঠে এসেছে। এমনকী একটি অবৈধ সম্পর্কের তথ্যও ঘোরাফেরা করছে। তবে যেভাবে শহরের বুকে ঠাণ্ডা মাথায় দুই কিশোরকে খুন করা হলো এবং প্রায় কুড়ি দিন ধরে মাস্টার মাইন্ড সত্যেন্দ্র বেপরোয়াভাবে ঘুরে বেড়ালো তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক।

তারপর হরিদেবপুর। অ্যাপ ক্যাব চালক যুবককে তাঁর বান্ধবীর পরিবার (বাবা, মা, নাবালক ভাই, ভাইয়ের বন্ধু ও বান্ধবী) খুন করে দেহ ফেলে দিল খালে। ঘটনায় উঠে এল ত্রিকোণ প্রেমের তথ্য। বান্ধবী ও তার মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জেরেই খুন হয়েছে অয়ন, এমন ধারণা তদন্তকারীদের। স্থানীয় সূত্রেও এমন দাবি করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও অয়নের পরিজনেরা তার পচাগলা মৃতদেহের খোঁজ পায় মর্গে। দুটি ঘটনায় হত্যাকারী ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছে। চেষ্টা করেছে অপরাধ লোপাটের। ঘটনার কথা মিডিয়া পর্যন্ত গড়িয়ে যাওয়ার পর পুলিশ অপরাধীদের ধরতে সক্ষম হলো।

প্রশ্ন উঠলেই সবকিছুতে বিরোধীদের চক্রান্ত দেখেন মাননীয়া। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি যখন রাজ্যের সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারছেন না তখনও মাইক হাতে গলা উঁচিয়ে বলবেন, 'আমি কিছুই করিনি, সব বিরোধীদের চক্রান্ত।'

এবার বীরভূমের একটি ঘটনার উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি। পাঁচ বছরের শিশুটিকে খুন করল পাশের বাড়ির পরিচিত ব্যক্তি। ওইটুকু বাচ্চাকে খুন করতে গিয়ে একবারের জন্যও হাত কাঁপেনি অপরাধীর! নিউটাউনের একটি নামকরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাশন ডিসাইনিঙের ছাত্রীর ধর্ষণের সাম্প্রতিক ঘটনাও কিন্তু অপরাধের ঘটনা প্রবাহে উঠে আসছে বারবার।

একুশের বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী সন্ত্রাস এ রাজ্যের সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের খুন, বাড়ি ভাঙচুর, বাড়ির মেয়েদের সম্ভ্রমহানি, ধর্ষণ সেই ছেচল্লিশের দাঙ্গার দুঃসহ স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে। তৃতীয়বার সরকারে আসার একবছর পূর্ণ হলো অথচ বিরোধী দলের কর্মীদের মৃত্যুমিছিল এখনও অব্যাহত। শুধু বিরোধী নয় শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে পরস্পর হানাহানিতে খুনের ঘটনাও এখন ডালভাত। ক্যানিং হোক বা বীরভূমের বগটুই ছবিটা সর্বত্রই এক।

কেন এত হত্যা, এত সন্ত্রাস আমাদের রাজ্যে? পশ্চিমবঙ্গে এখন অরাজক পর্ব চলছে। প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা। নিরাপত্তায় গাফিলতির জেরেই কি এরাজ্যের মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে? অথচ প্রশ্ন উঠলেই সবকিছুতে বিরোধীদের চক্রান্ত দেখেন মাননীয়া। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি যখন রাজ্যের সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারছেন না তখনও মাইক হাতে গলা উঁচিয়ে বলবেন, 'আমি কিছুই করিনি, সব বিরোধীদের চক্রান্ত।' □

প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ছক বড়ই অশুভ সংকেত

মণীন্দ্রনাথ সাহা

ইসলামি সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়ার (পিএফআই) বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) আধিকারিকরা। তাঁরা দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যার ছক করেছিল তারা। শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, ভারতের নানা প্রান্তে পিএফআই বিভিন্ন জনকে হত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে দাবি করেছে ইডি। আর সেজন্যে পিএফআই প্রচুর অস্ত্র ও বিস্ফোরক মজুদ করার কাজে নেমেছিল।

ইডি জানিয়েছে, বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন জায়গা থেকে ১২০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে এই সংগঠন। একাধিক দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য সেই অর্থ তারা খরচ করেছে বলেও ইডি জানিয়েছে। পিএফআই-এর এক কর্মীকে জেরা করে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে ইডি।

গত ২২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দেশের ১১টি রাজ্যে ইডি এবং এনআইএ অভিযান চালিয়ে পিএফআই-এর ১০০ জনের বেশি সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে। কেননা, তারা দেশে জঙ্গিদের অর্থ জোগানোর পাশাপাশি একাধিক সন্ত্রাসমূলক কাজে মদত দিচ্ছিল। ইডি এবং এনআইএ অপারেশন চালিয়ে কেরল থেকে গ্রেপ্তার করেছে শফিক পায়েত নামে এক পিএফআই কর্মীকে। জেরায় সে ইডিকে জানিয়েছে ১২ জুলাই পাটনায় নরেন্দ্র মোদীর একটি সভায় তাঁর ওপর হামলার ছক করেছিল পিএফআই। হামলার জন্য ১০০ কোটি

টাকারও বেশি অর্থ জোগাড় করা হয়েছিল। কিন্তু তারা সেই হামলা করতে পারেনি।

গত ১ আগস্ট স্বস্তিকায় '২০৪৭-এর লক্ষ্যে কোমর বাঁধছে ওরা' শিরোনামে প্রকাশিত আমার লেখা প্রতিবেদনে পিএফআই এবং তার সঙ্গে এসডিপিআই— এই দুই কট্টরপন্থী ইসলামি সংগঠন একযোগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ধরা পড়াতে আমার সেই প্রতিবেদন সঠিক বলে মান্যতা পেল।

২৯ আগস্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর নেতৃত্বে এবং 'এনআইএ' এবং 'আইবি' কর্তাদের উপস্থিতিতে পিএফআই-সহ কয়েকটি কট্টরপন্থী সংগঠনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর পরেই ২২ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, অসম, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, পদুচেরি, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রে পিএফআই-এর ২০টি কার্যালয়ে গোয়েন্দারা হানা দেয়।

আরও জানা গিয়েছে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোর, কুড্ডালোর, রামনাদ, ভিণ্ডিগাল, থেনি ও থেনকাসি-সহ অনেকগুলো এলাকায় পিএফআই নেতাদের বাড়িতে এবং চেন্নাইয়ের রাজ্য কার্যালয় পুরসাওয়াক্কামেও তল্লাশি চালানো হয়।

অন্যদিকে গুয়াহাটির হাতিগাঁও এলাকায় একই দিনে অসম পুলিশ ও এনআইএ-র যৌথ অভিযানে ৯ জন পিএফআই নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে তাদের কাছ

থেকে প্রচুর ভারত-বিরোধী নথি পাওয়া গিয়েছে। একইভাবে কলকাতার পার্কসার্কাসে ৫৯ সি, তিলজলা রোডে ২২ সেপ্টেম্বর ভোর ৩.৪০ মিনিটে অভিযান চালায় এনআইএ ও ইডির গোয়েন্দারা। জিলজলার ওই আবাসনের ভাড়া ঘরে সংগঠনের অফিস থেকে বিভিন্ন কম্পিউটার ঘেঁটে তদন্তকারীরা বেশ কিছু তথ্য পান এবং সন্দেহজনক কিছু জিনিসও তাঁরা বাজেয়াপ্ত করেন।

এই অভিযানে ১১টি রাজ্য থেকে ১০০-রও বেশি পিএফআই ও এসডিপিআই সদস্য-সহ সংগঠনের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কেরল থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে ২২ জন, মহারাষ্ট্রে ২০, কর্ণাটকে ২০, অন্ধ্রপ্রদেশে ৫, অসমে ৯, দিল্লিতে ৩, মধ্যপ্রদেশে ৪, পুদুচেরিতে ৩, তামিলনাড়ুতে ১০, উত্তরপ্রদেশে ৮, এবং রাজস্থান থেকে ২ জন মোট ১০৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২০১২ সালে কেরল সরকারের তরফে হাইকোর্টকে জানানো হয়েছিল যে, পিএফআই আসলে নিষিদ্ধ সংগঠন— স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়াই। এদের কার্যকলাপ দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনক। তারাই নাম বদলে এই নতুন সংগঠন তৈরি করেছে। এরপরই কেরল সরকারের তরফে পিএফআই-এর ফ্রিডম প্যারেডের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, পিএফআই-এর মাধ্যমে ভারতে জঙ্গি নিয়োগ করত আইসিস, জইশ-ই-মহম্মদ, আলকায়দা, লস্কর-ই-তৈবার মতো জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি। স্বাভাবিক ভাবে এই খবর সামনে আসায় উদ্বেগ বেড়েছে কেন্দ্রের। আর কোথা থেকে এই বিপুল অর্থ তারা সংগ্রহ করত, তা তদন্ত করে দেখছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে কেন্দ্র সরকার। কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরাগা জ্ঞানেন্দ্র জানিয়েছেন, পিএফআই এবং এসডিপিআইকে নিষিদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অনেক আগেই।

পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া (পিএফআই) ও তার সহযোগী সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সন্ত্রাস সৃষ্টি ও তাতে মদতদান, নির্মম হত্যাকাণ্ড, দেশের সংবিধানের প্রতি অশ্রদ্ধা, জনজীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ ছিল পিএফআই-এর বিরুদ্ধে। দলটির কাজকর্ম দেশের সংহতি, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে এক সমস্যার সৃষ্টি করছিল। এই কারণে পিএফআই-এর তৎপরতা খর্ব করতে দলটিকে বেআইনি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রিহ্যাব ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন (আরআইএফ), ক্যাম্পাস ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া (সিএফআই), অল ইন্ডিয়া ইমামস কাউন্সিল, ন্যাশনাল কনফেডারেশন অব হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন (এনসিএইচ আরও), ন্যাশনাল উইমেনস ফ্রন্ট, জুনিয়র ফ্রন্ট, এমপাওয়ার ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন এবং কেরলের রিহ্যাব ফাউন্ডেশনের মতো পিএফাআই-এর সহযোগী সংগঠনগুলিকেও বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন, ১৯৬৭-এর আওতায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো।

কেরল সরকার-সহ অন্যান্য রাজ্য সরকার সন্ত্রাসবাদী সংগঠন পিএফআই সম্পর্কে সজাগ হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সংগঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। তা যদি না হবে তবে কেরল সরকার জঙ্গিদের 'ফ্রিডম প্যারেডে'র ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও এ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানে কয়েকমাস আগে পিএফআই যেভাবে তাদের নিজস্ব পতাকা নিয়ে পুলিশের সামনে বিশাল মিছিল করেছে তা চমকে দেবার মতো। সেই মিছিলকে পুলিশের বাধা দেওয়া তো দূরের কথা বরং পুলিশ তাদের সাহায্য করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এখন প্রধান কাজ বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে নিরাপদে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া এবং বিরোধী দল বিশেষ করে বিজেপির যে কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রমে পুলিশ দিয়ে বাধা দেওয়া এবং সদস্যদের পেটানো।

কেন্দ্র সরকারের এবার বোধহয় গভীরভাবে ভাববার সময় এসেছে যে, বিপুল জনসমর্থন নিয়ে সরকারে থেকেও যদি সারাদেশে ইসলামি গোষ্ঠীগুলোকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করা না হয়, তারা সারাদেশে দাপিয়ে বেড়ায় এবং প্রধানমন্ত্রী-সহ বিভিন্ন নেতা-মন্ত্রীকে হত্যার পরিকল্পনা করে, বিভিন্ন সংগঠন, ধন-সম্পদ, প্রতিষ্ঠানের ওপর নাশকতা চালানোর চেষ্টা করে তাহলে তার দায় সরকারের ওপর বর্তাবে। কাজেই সেই জঙ্গিদের দেশ থেকে নির্মূল করতেই হবে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ওপর দেশবাসীর পুরো আশা ও ভরসা আছে যে ভারতে থেকে কোনো জঙ্গিই দেশ বিরোধী কোনো কাজেই সফল হবে না। আর জঙ্গিদের সমর্থনে যদি অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন পথে নামে তাদেরও রেয়াত করা চলবে না। দেশ বিরোধী যে কোনো সংগঠন সম্পর্কে সরকারকে সবদিক খতিয়ে দেখে এ বিষয়ে চূড়ান্ত পদক্ষেপ করতে হবে যেন তারা দেশের প্রধানমন্ত্রী-সহ যে কাউকে হত্যা করার কথা চিরতরে ভুলে যায়। □

বাংলাদেশের অগ্রগতির জন্য ভারতকে পাশে প্রয়োজন

শিতাংশু গুহ

২০২৪-এর নির্বাচনে আওয়ামি লিগ আবার ক্ষমতায় আসবে। র‍্যাবকাণ্ডে বিএনপি-র কিছু নেতাকর্মী ভাবছে তাঁরা ক্ষমতায় আসছেন। এ দিবাস্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। শেখ হাসিনা আছেন, তিনিই থাকবেন। দেশ ভালোই চলছে। কিছু সমস্যা আছে, তা সব দেশেই থাকে, থাকবে। জনগণ ভালো আছে, সেটাই মোদ্দাকথা। এক সময় ছিল, 'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ'। এখন 'শেখ হাসিনা বাংলাদেশ'। বঙ্গবন্ধুর সময় জাতীয় চার নেতা ছিল— ভাসানি, মুজাফফর আহমেদ, মনি সিংহ, ফরহাদ আরও কত নেতা ছিলেন। শেখ হাসিনার আমলে এখন কেউ নেই, তিনি একাই একশো। তিনিই মন্ত্রী, তিনিই প্রেসিডেন্ট, তিনিই এমপি, তিনিই সব।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত মারা যাবার আগে শেষবার নিউইয়র্কে এলে তিনি একান্তে এই প্রতিবেদককে বলেছিলেন, 'আজকের দিনে শেখ হাসিনার যে অবস্থান, সেটি তিনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন।' দাদার এ কথাটি আমি প্রায়শ ভাবি। কথাটি সত্য। ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনা যেদিন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন, সেদিন ঝিরঝির বৃষ্টিতে ফার্মগেট সংলগ্ন অধ্যক্ষ সাইদুর রহমানের বাড়ি 'সংশয়'-এর নীচে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখেছিলাম। সেই শেখ হাসিনা, আর আজকের শেখ হাসিনার বিস্তর তফাত। ২০২২-এর শেখ হাসিনা এক ও অনন্য।

শেখ হাসিনার মাথায় শুধু দেশের মঙ্গলের চিন্তা। সমস্যা নেই তা নয়, সব সমস্যার সমাধান শেখ হাসিনার কাছে। তিনি বঙ্গবন্ধু কন্যা। তিনি প্রধানমন্ত্রী। তিনি রাষ্ট্রনায়ক। কয়েকটি দেশ শেখ হাসিনাকে নিয়ে খেলছে, তিনিও খেলছেন। আগে খেলাটা ছিল একতরফা। এখন 'কেহ কারে নাহি ছাড়ে, সমানে সমান'। বঙ্গবন্ধুর পর দেশে বেশ ক'জন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থাকলেও রাষ্ট্রনায়ক ছিল না। এখন আছে, তিনি শেখ হাসিনা। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে তিনি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনিই পেরেছেন বিএনপির রাজনীতিকে ধূলিসাৎ করে দিতে, খালেদা জিয়াকে 'জিরো'তে পরিণত করতে। দেশে এখন জ্বালাও-পোড়াও নেই, লাশ নিয়ে রাজনীতি নেই, আন্দোলন নেই, রাজনৈতিক নেতারা ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। আওয়ামি লিগ কলাগাছকে নমিনেশন দিলে শেখ হাসিনার নামে কলাগাছ জিতে যায়।

হেফাজত ও ওলামা লিগ শেখ হাসিনার ছত্রছায়ায় বেড়ে ছিল। বিএনপি-জামাত ঠেকাতে তিনি এদের কাছে টেনেছিলেন। প্রয়োজন শেষ, তাই সময় বুঝে ছেঁটে দিয়েছেন। সন্ত্রাসবাদীরা ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিল। তিনি নির্মম ভাবে দমন করেছেন। মোল্লাবাদীদের এখন বাড়বাড়ন্ত। দেখা যাক, কীভাবে তিনি এদের সামলান। হিন্দুরা তাঁর আমলেও অত্যাচারিত, তাঁরা অখুশি, শেখ হাসিনা সেটা জানেন, তাঁদের খুশি করতে কী করেন তাও দেখার বিষয়। বিষয়টি হচ্ছে, যাঁরা অখুশি, রাগান্বিত, তাঁরাও জানেন, শেখ হাসিনা 'অগতির গতি'। জামাত বা কট্টর ইসলামপন্থীরা ওপরে শেখ হাসিনার প্রশংসা করলেও ভেতরে তাঁকে অপছন্দ করে। তবে তাঁরাও জানে, বিরোধিতা করে কিচ্ছু হবে না, তাই ওঁরা অনেকে এখন আওয়ামি লিগ হয়ে গেছে। শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকার এনেছেন, তিনিই এর কফিনে শেষ পেরেক মেরে দিয়েছেন। গণতন্ত্র কী তা তিনি জানেন, হয়তো সময়মত গণতন্ত্র ও সুষ্ঠু ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনবেন। আগে বলা হতো আওয়ামি লিগ পারে, এখন বলা হচ্ছে শেখ হাসিনা পারেন।

এতসব কীভাবে সম্ভব? একাত্তরে পাকিস্তানের পরাজয় প্রসঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন যে, 'এটি সম্ভব হয়েছে সেনাবাহিনীর দেশপ্রেম, চৌকশ নেতৃত্ব এবং তাদের সঙ্গে আমার চমৎকার সম্পর্কের কারণে'। আজকের বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম কারণ শেখ হাসিনা, সেনাবাহিনী, পুলিশ, প্রশাসনের চমৎকার সম্পর্ক। বিডিআর বিদ্রোহের পর শেখ হাসিনা উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সেনা ছাউনিতে গেছেন, এতে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনে যে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল এর সুফল এখন পাওয়া যাচ্ছে। সেদিন শেখ হাসিনা যে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব। করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা তিনি রোধ করতে সক্ষম হয়েছেন, এটি সাফল্য। পদ্মাসেতু দেশের চেহারা পালটে দেবে। দেশে মানুষের পকেটে পয়সা আছে, পেটে ভাত আছে, আর কী চাই? র‍্যাবকাণ্ডে হতাশা আছে, ভয়ের তেমন কারণ নেই, পরিস্থিতি আর নাজুক নাহলেই হলো। বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কমেছে। সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ঠেকাতে সরকার হিমশিম খাচ্ছে, এ বিষয়টি শেখ হাসিনাকে আরও তীক্ষ্ণভাবে নজর দিতে হবে, কারণ এতে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে।

এবারের ভারত সফর নির্বাচনের আগে সম্ভবত শেখ হাসিনার শেষ সফর। অনেকে ভেবেছিলেন ভারত তেমন পাত্তা দেবে না। বিমান বন্দরে একজন প্রতিমন্ত্রী তাঁকে স্বাগত জানালে তাঁরা খুশি থাকবেন। পক্ষান্তরে আওয়ামি লিগ কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। সফর শেষে বোঝা যায়, সফর সফল। যাঁরা ভেবেছিলেন, ভারত পাত্তা দেবে না, তারা নিরাশ হয়েছেন। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর এখন স্পষ্ট যে, বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হলে ভারতকে পাশে দরকার। ভারতও জানে, বাংলাদেশকে পাশে চাই। শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক 'রসায়ন' চমৎকার। দুই প্রধানমন্ত্রী গত ৭ বছরে ১২ বার মিলিত হয়েছেন। ভারতের অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিয়ে কারও সংশয় নেই। বাংলাদেশের নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ, আমরা চাই না সামনের নির্বাচন নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠুক। দুই দেশে ২০২৪-এ নির্বাচন। দেশ ও জনগণের সার্বিক উন্নয়নে শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদী জয়ী হন, আমরা তা চাই।

(লেখক প্রবাসী বাংলাদেশি)

নরেন্দ্র মোদীকে ক্ষমতাচ্যুত করতে আন্তর্জাতিক চক্র সক্রিয়

আনন্দ মোহন দাস

ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারের পতন ঘটানো বা অস্থির করার জন্য আন্তর্জাতিক চক্রগুলি নিরন্তর প্রয়াস করে চলেছে। সেটি সিএএ বিরোধী আন্দোলনে আর্থিক মদত দিয়ে হোক, বিভিন্ন আদালতে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পিআইএল কর্মীদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে হোক, কৃষি আন্দোলনে আর্থিক মদত দিয়ে হোক অথবা এনজিওগুলিকে রাষ্ট্র বিরোধী ও সরকার বিরোধী আন্দোলনে আর্থিক মদত দিয়ে হোক। পিছন থেকে সরকার বিরোধী আন্দোলনে নানাবিধ উৎসাহ প্রদান করে আন্তর্জাতিক চক্রগুলি কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চোখের আড়ালে কাজ করে চলেছে। শুধুমাত্র নরেন্দ্র মোদী হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রনায়ক বলে নয়, মূলত মোদীর দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠনে আপোশহীন সংগ্রামের বিরুদ্ধে এবং তাঁর আন্তর্জাতিক লবিগুলির স্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। প্রকৃতপক্ষে কারণ হলো মোদীকে কোনো ভাবেই আমেরিকার জন্য কেনা যায় না বা সিআইএ-র নির্দেশ মতো কাজ করানো যায় না। সূত্র মারফত জানা যায় 'মোদী হঠাও' অভিযানে আমেরিকার জে বাইডেন প্রশাসন কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে এবং পর্দার পিছন থেকে ভারতকে বাগে আনতে সমস্ত শক্তি দিয়ে মোদী সরকারের অবসানের জন্য কাজ করে চলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কংগ্রেস সরকারের আমলে নাকি সিআইএ ভারতের উন্নত মানের ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন নির্মাণে নিযুক্ত ইসরোর মুখ্য বিজ্ঞানী নামবি নারায়ণন-সহ অন্যান্য বিজ্ঞানীদের খরিদ করতে না পেরে গুপ্তচরবৃত্তির বদনাম দিয়ে প্রকল্পটি বন্ধ করিয়ে দেয় এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের জেলে বন্দি রেখে তাদের জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে দেয়। পরবর্তীকালে আদালত এই মিথ্যা অভিযোগের দায় থেকে সকলকে মুক্তি দেয়।

আমেরিকা আন্তর্জাতিক অস্ত্র, ফার্মা ও তেল লবিকে নিয়ন্ত্রণ করে। নিম্নোক্ত তিন মহিলার মাধ্যমে, তারা বিভিন্ন দেশে তার উদ্দেশ্য সাধন করে।

(১) সুজেন রাইস, (২) সামান্থা পাওয়ার, (৩) ভিক্টোরিয়া নুলানড।

এর মধ্যে ভিক্টোরিয়া মূলত আমেরিকার হয়ে সকল দেশের সরকার ভাঙার খেলায় মুখ্য কারিগর। গত মার্চ, ২০২২ ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষে ভ্রমণ করে কিছু রাজনৈতিক দল যেমন কংগ্রেস ও ডিএমকের সঙ্গে নাকি মিলিত হন, কিন্তু আলোচনার বিষয়বস্তু প্রকাশ্যে আসেনি। তারপরই কিন্তু রাহুল গান্ধী ও ডিএমকে প্রধান স্ট্যালিন দেশে ইউনিয়ন অব স্টেটস-এর দাবি করতে আরম্ভ করেছেন। শোনা যায় তামিলনাড়ুতে মূল্যবান রাসায়নিক থোরিয়াম উৎপাদন বন্ধ করতে গোপনে দেশের আন্দোলনজীবীদের উৎসাহ দেবার কাজ নীরবে করে চলেছেন। ভিক্টোরিয়া নুলানড সিএএ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব এবং কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বের সঙ্গে মিলিত হয়ে আর্থিক সহায়তা প্রদানে আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা যায়। পঞ্জাবে ইতিমধ্যে ফোরড ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আপ পার্টিকে আর্থিক সাহায্য করে চলেছে। তাছাড়া পিআইএল (জনস্বার্থ মামলা) কর্মীদের গ্রুপটির সঙ্গে বৈঠক করে তাদের আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন বলে শোনা যায়। এ ব্যাপারে তিনি ভারতে মোদী বিরোধী ব্যক্তি, সাংবাদিক ও কিছু রাজনৈতিক দলের সঙ্গে দেখা করেছেন। সুতরাং তিনি মোদীর রাজত্ব শেষ করার জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন। সূত্র মারফত আরও জানা যায় তিনি কৃষক আন্দোলনের সমর্থক ও সিএএ আন্দোলনের মদতদাতা সুপ্রিম কোর্টের উকিল কিরণ নন্দীর সঙ্গেও দীর্ঘ বৈঠক করেন। যিনি তিন তালাককে 'পছন্দ করার স্বাধীনতায়' হস্তক্ষেপ বলে আদালতে সওয়াল করেছিলেন। তিনি নাকি বলেছেন হিন্দুরা যদি বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে, তাহলে মুসলমানরাও তিন তালাক দিতে পারে।

যেহেতু ভারত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে আমেরিকার পক্ষে না গিয়ে নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছে, তাই নুলানড ভারতে থেকে উপরিউক্ত সংস্থাগুলিকে সরকার বিরোধী আন্দোলনে উৎসাহিত করতে উদ্যত হয়েছেন। আর্থিক মদত ছাড়াও তারা বিভিন্নভাবে সাহায্য করছে বলে জানা যায়। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী মাথা নত না করায় আন্তর্জাতিক চক্র তাঁর সরকার ফেলতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেজন্য আন্তর্জাতিক লবিগুলি চাপ দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করতে পরোক্ষে সরকার ভাঙার মদত দিচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ভিক্টোরিয়া নুলানডের পর নাকি মার্কিন প্রশাসনের কর্তা সামান্থা পাওয়ার এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভারতে আসছেন।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, আন্তর্জাতিক স্তরে প্রধানত তিনটি লবি বিশ্বকে শাসন করে বা নিয়ন্ত্রণ করে। (১) তেলের লবি,

(২) প্রতিরক্ষা লবি, (৩) ফার্মা লবি।

এই তিন লবি নিজেদের স্বার্থে সারা বিশ্বে যেনতেন প্রকারে নিজেদের পণ্য বিক্রি করার জন্য সমস্ত দেশকে অন্যায়ভাবে চাপ সৃষ্টি করে দেশগুলিকে তাদের শর্তে পণ্য কিনতে বাধ্য করে। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ধরনের লবিগুলির কাছে মাথা নত না করে এগুলির একচেটিয়া আধিপত্য খর্ব করার চেষ্টা করছেন। তাঁর ফলে এই লবিগুলি নানা রকমভাবে নিজেদের এজেন্টদের মাধমে দেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি করে মোদী হঠাও অভিযানে উদ্যোগী হয়েছে। শুধু যে মোদী কট্টর হিন্দুত্ববাদী জাতীয় নেতা বলে বিরোধিতা নয়, প্রকৃত পক্ষে মোদী বিরোধিতার মূল কারণ হলো দেশের স্বার্থে তিনটি লবির একচেটিয়া অধিকারকে খর্ব করতে মোদীর উদ্যোগ। মোদী সরকারের পতন ঘটানোর অন্যতম কারণ হলো তাদের করোনা ভ্যাকসিন না কিনে দেশে উৎপাদন করা বা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হওয়া, রাশিয়ার কাছ থেকে সস্তায় তেল ক্রয় করা এবং রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধে আমেরিকার পক্ষ না নিয়ে নিরপেক্ষ থাকা। বর্তমানে বাইডেন প্রশাসন এনজিও ও আন্দোলনজীবীদের মাধ্যমে ভারতের খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলকে ভাঙার জন্য উদ্যত হয়েছে বলে জানা গেছে। এদের আন্দোলনের মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহে বিঘ্ন ঘটিয়ে এক অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। এই ধরনের প্রচেষ্টা লালবাহাদুর শাস্ত্রীয় আমল থেকেই চলে আসছে। কারণ ভারত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিভিন্ন ভাবে আমেরিকা ভারতকে বিব্রত করার চেষ্টা করছে, যেমন বর্তমানে ভারতীয় ভিসা মঞ্জুর করতে ৮০০ দিন সময় লাগে, চীনাদের দুই দিনে ভিসা মঞ্জুর করছে, একথা ভারতের বিদেশমন্ত্রী প্রকাশ্যে জানিয়েছেন।

সামগ্রিকভাবে উল্লেখ্য নিম্নলিখিত মূল কারণগুলির জন্য এই আন্তর্জাতিক লবিগুলি দেশের মধ্যে তাদের দালাল চক্রের মাধ্যমে আন্দোলন তৈরি করে মোদীর বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করে চলেছে এবং কিছু রাজনৈতিক দলও এ বিষয়ে সহযোগিতা করছে বলে অনেকে মনে করেন।

(১) ড্রাগ কন্ট্রোল ব্যুরো প্রায় ৮০ হাজার ড্রাগ নষ্ট করেছে। তাঁর আর্থিক মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকা। যাদের ৮ লক্ষ কোটি টাকা নষ্ট হয় তারা স্বাভাবিক ভাবেই মোদীকে ঘৃণা করবে।

(২) ইডি দুর্নীতিগ্রস্ত লোকদের ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি কালো টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। যাদের কালো টাকা ধরা পড়েছে তারা কি মোদীকে সমর্থন করবে?

(৩) মোদী বহুজাতিক ঔষধ কোম্পানি ফাইজার ও মডার্নার করোনা ভ্যাকসিন আমদানি না করে দেশীয় কোম্পানিকে উৎসাহ দিয়ে ভ্যাকসিন তৈরি করিয়েছেন। আবার মোদী যোগ, আয়ুর্বেদ, স্বচ্ছতা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতায় জোর দেওয়ার ফলে কোম্পানিগুলির বিপুল পরিমাণ ব্যবসায়িক ক্ষতি হচ্ছে। ওই সব আন্তর্জাতিক ফার্মা লবি কি মোদীকে চাইবে?

(৪) মোদী সরকার প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ব সরকারি সিদ্ধান্ত মতো দালালের মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা বন্ধ করে প্রত্যক্ষ চুক্তির মাধ্যমে ফ্রান্স থেকে রাফেল বিমান কিনেছে এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমদানি হ্রাস করেছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার জন্য আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পে দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কিছু জিনিস রপ্তানিও করছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক তেল লবি ব্যবসা হারিয়ে মোদীর উপর প্রচণ্ড অখুশি। মোদীর উদ্দেশ্য হলো তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির একচেটিয়া আধিপত্য খর্ব করা। সেজন্য আন্তর্জাতিক তেল লবি কি মোদীকে চাইবে?

(৬) বিগত ৭৫ বছরের পচাগলা সরকারি ব্যবস্থা ও রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্তচোষা দুর্নীতির সমূলে উৎপাটন করতে যে সমস্ত পদক্ষেপ মোদী গ্রহণ করেছেন তার বিরুদ্ধে সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা মোদীর বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে। মোদী দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে যে অভিযান চালিয়েছেন দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা স্বাভাবিকভাবেই মোদীকে ঘৃণা করবেন এবং মোদীকে শাসন ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে।

(৭) মোদীর নেতৃত্বে বিশ্বের মধ্যে ভারতের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন।

মোদী আর একটি মেয়াদ শাসন ক্ষমতায় থাকতে পারলে এই সব দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ঘুঘুর বাসা যে পুরোপুরি সমূলে উৎপাটন করবেন এরা সকলেই জানেন, সেজন্যই এত বিরোধিতা। কিন্তু মোদীর প্রবল জনপ্রিয়তা এবং দেশের জনগণই তাঁর মূল ভরসা। পরিশেষে বলা যায়, দেশের জনগণ চাইলে পৃথিবীর কোনো শক্তি মোদীকে শাসন ক্ষমতা থেকে হঠাতে পারবে না। □

With Best Compliments From -

Balaji Marketing Agency

(Property Consultant Kolkata, Howrah)

Ph. 8240122538

E-mail : balaji_mrkt@yahoo.com

Shyamnagar, kolkata-700055

কেশবজী স্বয়ংসেবক পরিবারের পরমাত্মীয় ছিলেন

সুশান্ত রঞ্জন পাল

দীর্ঘ ৯৮ বছরের রাষ্ট্র সাধনার সমাপ্তি ঘটিয়ে অমৃতলোকে যাত্রা করলেন কেশবরাও দীক্ষিত। সেই সঙ্গে বাঙ্গলার সঙ্ঘ জীবনে একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটলো। তাঁর সাধনার স্থল ছিল এই বঙ্গভূমি। জন্মসূত্রে মারাঠি হলেও ব্যবহারিক জীবনে তিনি একজন খাঁটি বাঙ্গালি। বাল্যকাল থেকেই আমি তাঁর অফুরন্ত স্নেহ আর ভালোবাসা পেয়ে সঙ্ঘকেই জীবনের আদর্শ করে পথ চলা শুরু করেছি। মনে হচ্ছে 'পেয়েছি যত তার। পারি নাই দিতে কিছু মাত্র তার'।

পেশাগত কাজ ও রাজনীতি করার জন্য নিয়মিত সঙ্ঘ শাখায় উপস্থিত থাকতে পারি না। অভিভাবকতুল্য এক অধিকারী বললেন, তোমরা সঙ্ঘের কাছে ঝরা পাতা। মনটা একটু ভারাক্রান্ত হলো। কদিন পরেই কেশব ভবনে কেশবজীকে কথাটা বললাম। কেশবজী আদরের সঙ্গে পিঠে একটি থাপ্পড় মেরে গালে হাত বুলিয়ে দিলেন। মনে হলো তিনি বললেন— 'ঝরাপাতা গো আমি তোমারই দলে'।

পুরনো দিনের অনেক স্বয়ংসেবক, কার্যকর্তা ও পরিচিত অনেক শুভানুধ্যায়ী কেশবজীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। প্রত্যেকের সঙ্গেই কথা বলতেন এমনভাবে যেন কত আপনজন। খোঁজখবর নিতেন বাড়ির সবাই কেমন আছেন। জানতে চাইতেন সঙ্ঘ কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন কিনা। অনেক পরিচিত ব্যক্তি কোথাও কোনো কাজে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করতেন যে কেশবজী কেমন আছেন, অনেকদিন যাওয়া হয়নি। আমি বলতাম কেশবজী আপনার কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন, আপনি অবশ্যই কেশব ভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন।

২০ সেপ্টেম্বর কেশব ভবনে চিরনিদ্রায় শায়িত কেশবজী। বহু স্বয়ংসেবক, কার্যকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনসমাগম। আমি একটি কোণে বসে ছিলাম। একজন কার্যকর্তা আমার পাশে বসে বললেন, 'কেশবজী তো আপনার পরিবারের একজন সদস্য ছিলেন'। আমি মাথাটা নীচু করলাম মাত্র, পরক্ষণেই মনে হলো কেশবজী তো আসলে বাঙ্গলার সমস্ত স্বয়ংসেবক পরিবারের একজন সদস্য ছিলেন।

বালাসাহেব দেওরস (তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক) কলকাতা বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়েছেন। কার্যকর্তাদের সঙ্গে আমিও উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ ঘোষণা হলো যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য নাগপুরগামী বিমান ছাড়তে চার ঘণ্টা দেরি হবে। অনেকেই মত দিলেন কেশব ভবনে ফিরে যেতে, কিন্তু শ্রীকান্ত জোশী জানালেন বালাসাহেবের ইচ্ছা সুশান্তর বাড়িতে যাবেন। বাড়িতে এসে দেখি আমার স্ত্রী ও বউদি বাড়িতে নেই। কার্যকর্তা ও পুলিশ মিলিয়ে প্রায় ২৫-৩০ জন। তাদের গাড়ি বাড়ির চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। সত্যি বলতে একটু নার্ভাস লাগছিল। এদিকে শ্রীকান্তজী

বললেন, সুশান্ত, বালাসাহেবজীকে ইনজেকশন দেনেকা সময় হো গিয়া, সোমাজী কো বলো নাস্তা কা বন্দোবস্ত করনেকে লিয়ে। কেশবজী পাশেই ছিলেন। আমার মুখ দেখে সব বুঝতে পেরে বললেন চলো। সোজা রান্নাঘরে ঢুকে কাজের লোককে বললেন কোথায় কী আছে। কাজের লোক সব দিখিয়ে দিলে কেশবজী কাজ শুরু করে দিলেন। কেশবজী উপমা তৈরির ব্যবস্থা করছেন এমন সময় আমার স্ত্রী ও বউদি এসে পড়লেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সমস্ত কার্যকতা পুলিশ, ড্রাইভার সকলের বৈকালিক আহারের ব্যবস্থা হলো।

মাস তিনেক আগে কেশবজীর ঘরে বসে আছি। কেশবজী হঠাৎ বলতে শুরু করলেন— ডালহৌসিতে তোমার একটা ছোটো অফিস ছিল। এমার্জেন্সি পিরিয়ডে সেখানে আমরা বসতাম, ব্যাংকশাল কোর্টে স্বয়ংসেবকদের ধরে নিয়ে গিয়ে হাজির করানো হতো, তাদের খোঁজখবর নেওয়া, তাদের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, প্রয়োজনে কিছু সাহায্য করাই ছিল আমাদের কাজ। এমার্জেন্সি পিরিয়ডের আরও অনেক ঘটনার কথা উনি বলতে লাগলেন। এই বয়সেও কেশবজীর স্মৃতি অত্যন্ত প্রখর ছিল। বহু পুরনো স্বয়ংসেবককে টেলিফোন করে খোঁজ নিতেন।

ছোটোবেলার একটি ঘটনা মনে পড়ছে। শীতকালীন শিবিরে উপস্থিত হয়েছি। সান্ধ্যকালীন কার্যক্রমে আমরা ছোটো স্বয়ংসেবকরা উপস্থিত হয়েছি কিন্তু কোনো অধিকারীই তখনো আসেনি, তাই খুব হইচই চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছিল। হঠাৎ কেশবজী উপস্থিত হয়ে আমাকে একটি থাপ্পড় মারলেন, কারণ আমি কাছেই ছিলাম। আমার খুব রাগ হলো। রাত্রিবেলা শুয়ে আছি, হঠাৎ দেখি কেশবজী ঘরে ঢুকে আমার খোঁজ করছেন। আমার কাছে এসে বসলেন। আমার মুখে একটি লজেন্স গুঁজে দিলেন। আমার রাগ তখনও ছিল। ঘুম আসছিল না। কেশবজী মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো বিউগলের শব্দে।

বাড়িতে কেশবজীর জন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট ছিল। কেবলমাত্র সঙ্ঘ অধিকারী হিসেবেই নয় ব্যবহারিক জীবনে এত পরিপাটি ছিলেন যা প্রত্যেক স্বয়ংসেবকের কাছে অনুসরণযোগ্য। বাঙ্গলাকে এত ভালোবেসেছিলেন যে আমেরিকা প্রবাসী ভাইয়ের শত অনুরোধ সত্ত্বেও বেশি দিন আমেরিকাতে থাকতে পারেনি। বাঙ্গলার স্বয়ংসেবকদের মণিকোঠায় চিরকাল কেশবজীর নাম প্রজ্বলিত থাকবে। ফুল নয়, মালা নয় শুধু একটি প্রণাম— রাষ্ট্র তপস্বী কেশবজীকে শুধু একটি প্রণাম। □

কীর্তিঃ যস্য স জীবতি

রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী

১৯৫০ সালের প্রথম দিকে কেশবজী প্রচারক হিসেবে কলকাতায় আসেন। আর ওই সময়েই আমি আমার ভাইদের নিয়ে উল্টোডাঙ্গা শাখায় যেতে শুরু করি। তখন উল্টোডাঙ্গা শাখার মুখ্য শিক্ষক ছিলেন শ্যামমোহন দে। তখন থেকেই কেশবজীর সঙ্গে আমার পরিচয়। নিয়মিত ব্যায়াম করা সুগঠিত চেহারা। একবার দেখলে দ্বিতীয় বার ফিরে দেখতে ইচ্ছে হতো। সেই সময় কলকাতার পশ্চিম ভাগের প্রচারক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ছিল। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতা মহানগর প্রচারক, সহ-প্রান্ত প্রচারক, প্রান্ত প্রচারক এবং সহ-ক্ষেত্র প্রচারকের দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন।

১৯৫১ সালের শ্রীরামপুরের ঐতিহাসিক ১৫ দিনের প্রাথমিক শিক্ষা বর্গের শিক্ষক ছিলেনকেশবজী। ওই শিক্ষা বর্গে আমি শিক্ষার্থী ছিলাম। ১৯৫৩ সালে গয়াতে আমার প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ হয়। কেশবজী আমার শিক্ষক ছিলেন। ১৯৫৫ সালে পাটনাতে দ্বিতীয় বর্ষের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গেও তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন। একজন আদর্শ দক্ষ শিক্ষক হিসেবে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য এবং বাঙ্গলার ইতিহাসের উপর কেশবজীর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, বনফুল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙ্গলার প্রখ্যাত সাহিত্যিকের রচনা তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। চিঠিতে কেউ বানান ভুল লিখলে তিনি শুধরে দিতেন।

কেশবজী সুগায়ক ছিলেন। তাঁর কণ্ঠে ডি. ভি. পালুসকড়ের বিখ্যাত ভজন 'ঠুমক চলত রামচন্দ্র' যারা শুনেছেন তারা মুগ্ধ হয়ে যেতেন। আমি প্রার্থনার শুদ্ধ উচ্চারণ গোখলেজীর কাছ থেকে শিখেছি কিন্তু সুর-সহ শুদ্ধ উচ্চারণ কেশবজী আমাকে শিখিয়েছেন। ক্রিকেট খেলায় ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিঙে সমান দক্ষ খেলোয়াড়কে 'অলরাউন্ডার' বলা হয়। কেশবজী সঙ্ঘের এই দৈবী কাজে 'অলরাউন্ডার' ছিলেন। শারীরিক, বৌদ্ধিক, ঘোষ, ব্যবস্থা, সম্পর্ক, সেবা সমস্ত বিভাগে তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে উন্নতমানের ঘোষ বিভাগ দাঁড় করানোর পেছনে কেশবজীর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঘোষের সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট তিনি বাজাতে জানতেন কিন্তু ঘোষের সাধারণত শঙ্খ বাজাতেন।

আমি যখন প্রান্ত কার্যবাহের দায়িত্বে ছিলাম তখন থেকেই কেশবজীর শরীর মাঝে মাঝে দু-চার দিনের জন্য খারাপ হতো, আবার ভালো হয়ে যেতেন। সেই সময় শেষাদ্রিজী সরকার্যবাহ। তাঁকে আমি বলেছিলাম এখানকার আবহাওয়ার জন্য কেশবজীর শরীর খারাপ হচ্ছে তাই তাঁকে পুনা বা নাগপুরে ড্রাই আবহাওয়ায় নিয়ে গেলে হয়তো তিনি ভালো থাকবেন। শেষাদ্রিজী কেশবজীকে সেই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কেশবজী বললেন, যুবক বয়সে কাঁচা চুলে আমি বাঙ্গলায় এসেছি। এখানে সঙ্ঘের কাজ করতে করতে আমার চুল পেকে গেছে। স্বয়ংসেবকদের বাড়িতে ছোটোদের কাছে আমি 'দাদু' হয়ে গেছি। আমার ইচ্ছা এই বাঙ্গলাতেই আমার দেহপাত হোক। এরপর তো আর কোনো কথা চলে না। তিনি বাঙ্গলাতেই থেকে গেলেন এবং বাঙ্গলাতেই 'আগাগোড়া বাঙ্গালি' কেশবজীর দেহপাত হলো। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার হাজার হাজার পরিবার কেশবজীকে তাদের বাড়ির একজন সদস্য মনে করে। তারাও পরিবারের সদস্য হারানোর ব্যথায় ব্যথিত। কেশবজীর বিশেষ স্নেহধন্যদের মধ্যে আমিও একজন। বাংলা নববর্ষের পরে এবং বিজয়ার পরে কেশব ভবনে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতাম। প্রণাম নিতে চাইতেন না। জোর করেই প্রণাম করতাম। আমার কাছে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার আর কেউ রইলেন না।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরামরাও হেডগেওয়ার ঈশ্বর প্রেরিত ঋষি ছিলেন। বৈভবসম্পন্ন হিন্দুরাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এসেছিলেন। তাঁর এই দৈবী কর্মযজ্ঞকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ঈশ্বর শত সহস্র 'দেবদূতকে' পাঠিয়েছেন এবং পাঠাবেন। এই ঈশ্বরীয় কাজকে সফল করার জন্য উচ্চশিক্ষা সমাপনান্তে সংসারের যাবতীয় মোহ ত্যাগ করে যারা সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে সমগ্র জীবন দান করেছেন তাঁরা সকলেই দেবদূত। প্রয়াত কেশবজী অন্যতম অগ্রবর্তী দেবদূত ছিলেন। কিছুকাল স্বর্গবাসের পরে আবার এই দৈবী কর্মযজ্ঞকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি ফিরে আসবেন। তাই তাঁর আত্মার সদগতি কামনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কেশবজীর উদ্দেশে শত সহস্র সশ্রদ্ধ প্রণাম।

(লেখক পূর্বতন ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক)

দিব্য দেহধারী কেশবরাও দীক্ষিত

বিধান চন্দ্র আখুলি

দিব্য চেহারা ছিল কেশবজীর। যেন কোনো দক্ষ ভাস্কর মর্মর দিয়ে, তার নিপুণ হাতে, অতি যত্নে খোদাই করেছিলেন এই মূর্তিটিকে। কেশবজীর দেহ থেকে এক দিব্য জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতো। প্রশান্তিভরা মুখমণ্ডলে বিরাজ করত মন ভোলানো হাসি। রাস্তা দিয়ে কেশবজী হেঁটে গেলে পথচারীরা বার বার ঘুরে দেখতেন। সম্ভ্রমে মাথা নত হয়ে আসত। কেশবজী ছিলেন ভারতমায়ের এক সুযোগ্য সন্তান, যিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনকাল রাষ্ট্র ও সমাজের কল্যাণে নিজেকে তিল তিল করে বিলিয়ে গেছেন। তাঁর তপস্যা ছিল নিত্য শাখা। ঈশ্বরের প্রতীক স্বরূপ পরমপবিত্র গৈরিক ধ্বজকে মাঠের মধ্যে স্থাপন করে প্রতিদিন এক ঘণ্টা শরীরচর্চা ও বৌদ্ধিক চর্চার মাধ্যমে দেহ ও মনের বিকাশ সাধন করে, হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করে আমাদের রাষ্ট্রকে পরম বৈভবে নিয়ে যাওয়া।

কেশবজী ছিলেন 'কম্বুকণ্ঠী'— গুরুগম্ভীর কিন্তু মিষ্টি। তিনি মেঘনির্ঘোষ কণ্ঠে গান গাইলে একটি আলাদা পরিবেশ রচনা হতো। তিনি নিজেও বহুগান লিখেছেন। তাঁর মাতৃভাষা মারাঠি। তিনি মারাঠি ও সংস্কৃত ভাষায় স্নাতক ছিলেন। তিনি মারাঠি, সংস্কৃত, হিন্দি ও বাংলায় বহু গান রচনা করে গেছেন। 'সঙ্ঘ মানে শাখা, শাখা মানে কার্যক্রম' বাঙ্গলার স্বয়ংসেবকদের কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হয়।

কেশবজী নিখুঁত ভাবে গীতার শ্লোক উচ্চারণ করতেন। গীতার গূঢ়রহস্য তিনি সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন। এক বর্গে তাঁর গীতার ক্লাস শুনেছিলাম। কেশবজীর কাছ থেকে গীতার সহজ ব্যাখ্যা শোনার পর গীতা আমার কাছে একটু করে বোধগম্য হতে থাকে। তাঁর কাছ থেকেই আরও শুনেছিলাম জ্ঞান যোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, এরূপ নানান যোগ অবলম্বন করে অনেক মহাপুরুষ কীভাবে মহাশক্তিশালী কাম থেকে মুক্তিলাভ করেছেন বা ঈশ্বর লাভ করেছেন।

সঙ্ঘের এক কার্যকর্তা ছিলেন ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী (রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের অধ্যাপক) তিনি কেশবজীকে গীতা নিয়ে কিছু প্রশ্ন করেন। আলোচনা থেকে তর্ক শুরু হয়। ড. ব্রহ্মচারী যুক্তি খাড়া করেন, কেশবজী তা খণ্ডন করেন। আলোচনার সেই কথাগুলি আজ আর মনে নেই, তবে একটি কথা মনে আছে, কেশবজী এক সময় বলে ওঠেন, 'প্রফেসর ব্রহ্মচারী, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অনেক ডেফিনেশন আছে, এই ডেফিনেশনটি হয়তো আপনার পছন্দ হবে, অধ্যাত্ম শাস্ত্র এমন একটি শাস্ত্র যাকে অবলম্বন করে পরম সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সংজ্ঞাটি ড. ব্রহ্মচারীর পছন্দ হয়েছিল কিনা জানি না তবে আমার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে যায়।

কেশবজী খুবই রসিক মনের মানুষ ছিলেন। ব্যক্তিগত কথাবার্তায় এমনকী সঙ্ঘের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণেও মজা করতে ছাড়তেন না। একবার একটি কার্যক্রমে ভাষণের মাঝে তিনি বলছেন, 'এখন আমাদের অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ, সাংবাদিকরা এখন আমাদের কথা লিখছে, বুদ্ধিজীবীরা আমাদের কথা ভাবছে, প্রশাসন আমাদের সমীহ করতে শুরু করেছে। এমনকী গ্রহ-নক্ষত্রগুলো পর্যন্ত তাদের কক্ষপথ ছেড়ে এসে আমাদের সাহায্য করছে। এরকম একটা অনুকূল পরিস্থিতিতে আমরা নিজেরা নিজেদের ঠিক ঠিক সাহায্য করছি তো?

একবার কেশবজী বাসে করে যাচ্ছিলেন। তখন বাসের মধ্যে নানান সতর্ক বাণী লেখা থাকত। যেমন 'মালের দায়িত্ব আরোহীর', 'সঠিক পয়সায় ভাড়া দিন',

'ধূমপান করবেন না' ইত্যাদি। কেশবজী যেখানে বসেছিলেন তার পাশেই কয়েকজন প্যাসেঞ্জার দাড়িয়ে ছিলেন। একটি গাট্টাগোট্টা ধরনের লোক বাসের মধ্যে সিগারেট ধরায়। সঙ্গে সঙ্গে একজন প্যাসেঞ্জার তাকে 'ধূমপান করবেন না' লেখাটি দেখিয়ে দেন'। বেয়াড়া লোকটি একমুখ ধোঁয়া ওই লেখাটির উপর ছুঁড়ে দিয়ে বলেন ওই লেখার উপর আমি প্রস্রাব করি। সঙ্গে সঙ্গে বাসের সমস্ত প্যাসেঞ্জার কেশবজীর দিকে তাকান, তাঁরা কেশবজীর নিকট কিছু প্রতিবাদ আশা করছিলেন। কেশবজী বলেন তিনি মুখ দিয়ে প্রস্রাব করতে পারেন, তার থেকে দূরে থাকাই ভালো। বাসের প্যাসেঞ্জাররা হো-হো করে হেসে উঠলেন।

বহুরূপে কেশবজীকে পেয়েছি আমরা। কেউ সন্তান রূপে, কেউ ভাই রূপে, কেউ দাদা রূপে, কেউ কেউ পিতা রূপে, কেউ-বা দাদু রূপে। দীঘ ৭২ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন বাঙ্গলায়। বাঙ্গালির মতো করেই তিনি বাংলা বলতে পারতেন। বাংলা ভাষায় বহু গান, বহু কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের শিবাজী উৎসব কবিতাটি বহু স্বয়ংসেবকের হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে। বাংলা ভাষায় তাঁর এতটাই দখল ছিল যে বাঙ্গালির কথাবার্তাতেও তিনি ভুল শুধরে দিতেন।

কেশবজী ছিলেন অতি সংযমী পুরুষ। তাঁর শরীরে ছিল অমিত শক্তি, সিংহের মতো বিক্রম। একবার অনন্তদা একটি ঘটনা আমাদের বলেন। বাঙ্গলায় তখন বামফ্রন্টের প্রবল প্রতাপ। ৬০-এর দশকের কোনো একটা সময়। একদল বামপন্থী পরিকল্পনা করেছিল সঙ্ঘের প্রান্ত কার্যালয় আক্রমণ করার। তারা ভেবেছিল, এর ফলে তাদের বিরাট প্রচার হবে। মুসলমানরা খুশি হয়ে তাদের প্রতি সদয় হবে। খবর কাগজের প্রথম পাতায় বড়ো হেডলাইন দিয়ে খবরটি ছাপা হবে। তখন সঙ্ঘের প্রান্ত কার্যালয় ছিল ২৬নং বিধান সরণীতে। হঠাৎ দেখা গেল লাল পতাকা হাতে দলে দলে লোক স্লোগান দিতে দিতে ২৬নং কার্যালয়ের সামনে জড়ো হচ্ছে। সেদিন কেশবজী কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন। মুগুর ভাঁজছিলেন। ঘর্মাক্ত কলেবরে হাফ প্যান্ট পরা অবস্থায় গায়ে এক উত্তরীয় জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর দিব্য রূপ দেখে ৯০ শতাংশ লোক শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে কেশবজীকে দেখতে লাগলেন। স্লোগানের আওয়াজ কমে যেতে লাগল। কেশবজী ডাকলেন আলোচনার জন্য। নেতারা কোনো কথাই বলতে পারল না। কেশবজীর বাচনভঙ্গি, কণ্ঠস্বর ও যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা শুনে পিছু হঠতে শুরু করল। নেতা-কর্মীরা দেখল, তাদের প্ল্যান মাঠে মারা যাবে। তাই কিছু একটা করে যেতে হবে এরকম একটা মরিয়া ভাব নিয়ে কেশবজীকে বল প্রয়োগ করে দরজা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করতে লাগল। এই সময়টার জন্যেই যেন কেশবজী অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ এমন এক ধাক্কা দিলেন যে পাঁচ-সাতজন একসঙ্গে ছিটকে পড়ল। সিংহের মতো হুংকার দিয়ে উঠলেন। গর্জন করে বললেন— কে আছিস বাপের বেটা, চলে আয়। তাদেরই একটি মোটর সাইকেল দুহাতে তুলে তেড়ে গেলেন তাদের দিকে। সবাই পড়ি কী মরি করে পালাতে লাগল। অনেকেই পথ চলতি মানুষের ভিড়ে লুকিয়ে পড়ল! কেশবজী মোটর সাইকেলটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কাপুরুষের দল সব পালিয়ে গেল। ইচ্ছা করলে কেশবজী হাত পা দুমড়ে, মেরুদণ্ড মুচড়ে, কোমর ভেঙে দশ- বিশটাকে ঘায়েল করে দিতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। মোটরসাইকেলটিও ছুঁড়েছিলেন একটি ফাঁকা জায়গা দেখে। শুধুমাত্র একটু বিক্রম প্রদর্শন করেছিলেন, তাতেই কাজ হয়ে যায়। একেই বলে ব্রহ্মতেজ।

দীর্ঘ ৭২ বছর বাঙ্গলায় অবস্থানকালে শুধু একবারই তিনি তাঁর বিক্রম প্রদর্শন করেছিলেন। কেশবজী সমস্ত স্বয়ংসেবককেই খুব ভালোবাসতেন। আমি ভাবতাম আমাকে তিনি একটু বিশেষ ভাবে ভালোবাসেন। পরে দেখেছি, সমস্ত স্বয়ংসেবকের মধ্যেই এরকম ভাবনা রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম কেশবজীর প্রেরণাতেই নিবাস তৈরি হয় বাঁকুড়া জেলার মোলবনা গ্রামে। বাঁকুড়া জেলার প্রথম শিশুমন্দির প্রতিষ্ঠা হয় মণ্ডলকুলি গ্রামে, তাও কেশবজীর প্রেরণাতেই। বাঁকুড়া জেলার মণ্ডলকুলি গ্রামের উপর তাঁর বিশেষ টান ছিল তাই তিনি বার বার ওই গ্রামে আসতেন। মণ্ডলকুলি গ্রাম থেকেই কেশবজীর স্নেহধন্য সুকুমার পাত্র সঙ্ঘকাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। ২০১৫ সালে তিনি শেষবারের মতো মণ্ডলকুলি গ্রামে আসেন।

কেশব রাউত নামে ওড়িশার এক ফিল্ম প্রডিউসারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, তিনিও স্বয়ংসেবক। তাঁর একটি সিনেমায় একটি মহান চরিত্রের জন্য এক দিব্য দেহধারী পুরুষ চরিত্রের প্রয়োজন ছিল। তিনি কেশবজীকে ওই মহান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রস্তাব রাখেন। কেশবজী ওই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি কেশবজীকে বোঝাতে থাকেন যে তাঁকে একটি মহান চরিত্রে দেখানো হবে। কেশবজী তাতে রেগে যান, বলেন জানি আপনি আমাকে ডাকাত সর্দারের ভূমিকা দেবেন না, কিন্তু এতে সমাজে সঙ্ঘের ক্ষেত্রে একটি ভুল বার্তা যাবে। আর আপনি এই বিষয়টি কারও কাছে প্রচার করবেন না।

ঝাড়গ্রাম শহরে একবার এক অতিবাম সংগঠনের নেতার সঙ্গে কেশবজীর সাক্ষাৎ হয়। কেশবজী ওই নেতার ভাষণ শুনেছিলেন। তাই নেতাটিকে তাঁর বাচনভঙ্গি বিষয়ে প্রশংসা করে তাকে একটি ভারতমাতার চিত্রযুক্ত পকেট ক্যালেন্ডার দেন। নেতাটি চলে গেলে বলেন বিপথগামী হলেও ওরা তো ভারত মায়েরই সন্তান। আমাদের ভাই।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস সব বিষয়েই কেশবজীর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল মারাঠি ও সংস্কৃত ভাষায় স্নাতক। কেশবজী বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও মারাঠিতে সাবলীল ভাবে কথা বলতে পারতেন।

ঝাড়গ্রামে মানবসেবা প্রতিষ্ঠানের একটি বিরাট বাড়ি আছে। একটি কাগজ কলের কোম্পানি ওই বাড়িটি দান করে। ওই বিল্ডিঙের একটি ঘরে সঙ্ঘের কার্যালয় এবং অন্য রুমগুলিতে শিশুমন্দির ছিল। একবার ওই দুই কার্যকর্তার মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয় এবং তা এমনই তুমুল আকার ধারণ করে

বাঁকুড়ায় রাজদীপ মিশ্রের শুভবিবাহে মঙ্গলনিধি অনুষ্ঠানে কেশবজী।

যে কলকাতা থেকে কেশবজীকে ছুটে আসতে হয়। কেশবজী এসে দুই কার্যকর্তাকে তাঁর ডাইনে বাঁয়ে বসিয়ে দুজনের কাঁধে দুই হাত রেখে সঙ্ঘের নানান বিষয়ে কথা বলতে থাকেন। ঝগড়ার বিষয়ে একটি শব্দও খরচ না করেও বিবাদটি মিটে যায়। পরবর্তীকালে এই দুই কার্যকর্তার মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

কেশবজী মজার গল্প বলতেন। কেমন ভাবে আমরা আমাদের পরিশীলিত, মার্জিত, বিজ্ঞানসম্মত সমাজ ব্যবস্থা ছেড়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে ধাবিত হচ্ছি, তা বোঝাতে একটি ন্যুড ক্লাবের গল্প বলেছিলেন।

একবার এক স্বয়ংসেবক আর এক স্বয়ংসেবকের আর্থিক দুরবস্থার কথা শাখার মুখ্য শিক্ষকের কাছে বলছিলেন। শুনে মুখ্য শিক্ষক কিছু লঘু মন্তব্য করেন। তাতে কেশবজী খুবই দুঃখ পান। ওই প্রসঙ্গে কেশবজী বেশ কিছু কথা বলেছিলেন। একটি কথা আমার মনে আছে, 'হৃদয়হীনরা ভালো অ্যাডমিনিস্ট্রেটার হয়, কিন্তু আমরা চাই হৃদয়বত্তার সঙ্গে দক্ষ সংগঠক।' একজন স্বয়ংসেবক সমস্যায় পড়লে বাকিদের উচিত এগিয়ে আসা, তাকে সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করা।

করোনার সময় কেশবজী ফোনে সমস্ত স্বয়ংসেবকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। আমাকেও তিনি 'প্রিয়দার' ফোন থেকে ফোন করেছিলেন। করোনাকালে যাতে সমস্ত স্বয়ংসেবক পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, সঙ্ঘের বই পড়া, সঙ্ঘের বিষয়ে কিছু লেখালেখির মাধ্যমে সময় কাটানোর কথা বলেন। তাঁর প্রেরণাতেই আমি সঙ্ঘের উপর কয়েকটি গান লিখি। গানগুলি কেশবজীর পছন্দ হয়।

ডাঃ সুভাষ সরকার (বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) কেশবজীকে খুবই শ্রদ্ধা করেন। কেশবজীর প্রেরণাতেই ডাঃ সরকার বাঁকুড়া জেলার বহু মানুষের নামমাত্র খরচায় কখনও-বা বিনা খরচে চিকিৎসা করেছেন। একবার কেশবজী বাঁকুড়া নিবাস থেকে স্টেশনে যাবেন, ডাঃ সরকারের গাড়িতে করে নিয়ে যাবার কথা, গাড়ি আসতে দেরি হয়। কেশবজী ডাঃ সরকারকে খুবই বকা দেন। সেদিন ট্রেন লেট ছিল, তাই ট্রেনটি পেয়ে যান। কেশবজী বলেন ট্রেনের টাইমের ১০ মিনিট আগেই স্টেশনে পৌঁছাতে হয়। ডাঃ সরকার কেশবজীর এই উপদেশের কখনও অমান্য করেননি।

শ্যামলালদার সঙ্গে কেশবজীর খুবই মধুর সম্পর্ক ছিল। কোনো ত্রুটি দেখলে শ্যামলালদাকে ধমক দিতেন। কেশব ভবনে তথা বাঙ্গলায় একমাত্র শ্যামলালদাই ছিলেন যিনি কেশবজীকেও ধমক দিতে পারতেন। কেশবজী এ প্রসঙ্গে গীতার একটি শ্লোক উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন পরস্পর গুণের সংবর্ধনা করতে করতে পরস্পর পরস্পরকে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে নিয়ে যেতে হয়।

শ্যামলালদা কেশবজীর খুব খেয়াল রাখতেন। তাই বোধহয় শ্যামলালদাও কেশবজীর অনুসঙ্গী হয়ে গেলেন।

শেষ সময়েও কেশবজী মজা করতে ছাড়েননি। কেশবজীর শরীর অসুস্থ, নার্সিংহোমে ভর্তি, কয়েকজন বড়ো আধিকারিক কেশবজীকে দেখতে গেছেন, সে সময় কলকাতায় সঙ্ঘের একটি বড়ো কার্যক্রম চলছিল। কেশবজী ওই আধিকারিকদের বললেন, আমার তো কিছু হয়নি, আমাকে কার্যক্রমে যেতে দেবে না বলেই সুদীপ নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিয়েছে। এমনি ভাবে হাসতে হাসতে হাজার হাজার স্বয়ংসেবকদের কাঁদিয়ে তিনি চলে গেলেন।

তাঁর পার্থিব শরীর গেলেও হাজার হাজার স্বয়ংসেবকের হৃদয়ে তিনি বিরাজ করবেন ধ্রুবতারার মতো, তিনি আমাদের দিশা দর্শন করতে থাকবেন। □

স্মরণে মননে শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিমলকৃষ্ণ দাস

বিদ্যুৎদা পরলোকগমন করেন ২ আগস্ট। মোবাইল স্ক্রিনে সংবাদটি ভেসে উঠতেই প্রথম মনে হলো, আর বাঁকুড়া থেকে কেউ বলবেন না—'কেমন আছিস? মাঝে মাঝে একটু ফোন করলে তো পারিস, এই বয়সে কেউ ফোন করলে, কথা বললে ভালো লাগে।' বেদনা মিশ্রিত এক চিন্তার বলয় তখন তার পরিধি প্রসারিত করতে শুরু করেছে। মনে হলো কেশবজী কেমন আছেন! শ্যামলালদা! বিদ্যুৎদা শ্যামলালদাকে ডাকতেন 'শ্যামলাল' বলে। তাঁদের মধুর সম্পর্ক অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি। সংবাদ জানার জন্য মনে তখন কেমন যেন এক ব্যাকুলতা অনুভব করলাম। ফোন নম্বর কাজ না করায় ভেবে ভেবে জলধরদাকে ফোন করে পেয়ে গেলাম। আগে কেশবজীর কথা জানলাম, অসুস্থ কিন্তু মোটামুটি ভালো আছেন। শ্যামলালদার নম্বরটা দিতে অনুরোধ করলে জলধরদা বললেন—'আমরা একফ্লোরেই থাকি, উনি পাশেই আছেন, নিন কথা বলুন।'

—শ্যামলালদা, কেমন আছেন?

—'আমি ভালো আছি, তোমরা, ছেলে বউমা?' মিনিট দুয়েক কথা। কয়দিনের শূন্যস্থান, তারপর অকস্মাৎ চলে এল ২০ সেপ্টেম্বর, ২৩ সেপ্টেম্বর। বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শুধু লিখলাম—'বেদনা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না'; আর কোনো শব্দ, কোনো বাক্য বা প্রথাগত কোনো প্রার্থনা আসেনি; কারণ সমস্ত কথা প্রার্থনার ভাষা অব্যক্ত রূপে একান্তে তখন চোখ গড়িয়ে ঝরে পড়ছিল। স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলি খুব দ্রুত সরে যেতে শুরু করল। ভাবতে পারছিলাম না, শুধু খুঁজছিলাম। এটুকু আবার উপলব্ধি করলাম যে পথ ধরে এক-পা দু-পা করে আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি সে পথ চিনিয়ে দিয়েছিলেন শ্যামলালদা। কেমন করে পথ ধরে এগোতে হবে তা হাত ধরে শিখিয়েছিলেন তিনি।

১৯৬৮ সাল। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছি মাত্র। এসময় ধুবুলিয়ায় শুরু হলো সঙ্ঘের শাখা। একটি উদ্বাস্তু অঞ্চল, আর্থিক দিক থেকে বেশিরভাগ অসচ্ছল পরিবার, সামাজিক সমস্যাবহুল জায়গা। শ্যামলালদা তখন নদীয়া জেলা প্রচারক। মাঝে মধ্যেই আসতেন, আমাদের সমস্ত কাজের সঙ্গী হতেন তিনি। আমাদের শাখাটি শ্যামলালদার কাছে ছিল বিশেষ আগ্রহের। নিত্য উপস্থিতি ষাট-সত্তর। ব্যবস্থিত উদ্যমশীল একটি শাখা। যে কোনো উৎসব বা বিশেষ অনুষ্ঠানে শতাধিক স্বয়ংসেবক উপস্থিত থাকতো। আমার উপরে মুখ্য শিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হলো। ভালোবাসতেন, ভরসা দিতেন, আবার প্রয়োজনে মৃদুস্বরে বকতেনও। একবার শাখার শেষ অংশে বৈঠকে কেমন এক হাসির সংক্রামক ব্যাধি শুরু হলো। হঠাৎ শ্যামলালদা একটু কঠিন হয়ে বললেন, শাখায় এরকম ছেলেমানুষি শোভা পায় না। সদ্য প্রবাহের মধ্যে পড়া পাথরের কোণগুলো যেন ভাঙতে শুরু করলো। ধুবুলিয়া থেকে কৃষ্ণনগর কাছেই। নানা বৈঠকে জেলা কার্যালয় 'মতিসুন্দরী ভবন'-এ ডাকতেন, রাত্রিবাস করতে আগ্রহ করতেন। তখন জনাচারেক কলেজ ছাত্র সেখানে থাকতো। প্রভাত শাখায় যাওয়া, স্বয়ংসেবকদের বাড়ি নিয়ে ঘোরা, থাকা, কেমন করে কোথায় কীভাবে কী বলতে হয় সব যেন হাত ধরে শেখাতে লাগলেন। তখন বুঝিনি, আজ তা স্পষ্ট বুঝি, অনুভব করি। অদ্ভুত লেগেছিল যখন দেখেছি সরস্বতী পুজার উদ্যোগে শ্যামলালদা আমাদের সঙ্গে কাঁধে করে প্রতিমা বয়ে আনছেন। সে বছরই আমাকে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে পাঠালেন। পাঠালেন এই জন্য বলছি, আমার শুল্ক ইত্যাদি দেওয়ার সামর্থ্য না থাকায় শ্যামলালদাই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেবার সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ হয়েছিল বেলডাঙ্গায়। শ্যামলালদার নির্দেশে প্রথম কলকাতায় গেলাম। ২৬নং-এ সেই প্রথম কেশবজীকে দর্শন করলাম।

কেশবজীর নামে একটি চিঠি দিয়েছিলেন আমার এক বিশেষ সমস্যা মেটাতে। পরিচয় হলো বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির এক কার্যকর্তার সঙ্গে। স্থির হলো আমাকে দীর্ঘকালীন বিদ্যার্থী বিস্তারক হিসেবে বোলপুরে যেতে হবে। আমার সঙ্ঘায়ু তখন ১১ মাস। শ্যামলালদা আমাকে ছোটো ভাইয়ের মতো সবকিছু দিয়ে তৈরি করে বর্ধমান পৌঁছে মাধবদার (মাধব বনহট্টি) হাতে সঁপে দিলেন। বোলপুরে পরিচিত একজনের রেলকোয়াটার্সে আমাকে থাকতে হতো। ভদ্রলোক একা, মাঝে মাঝে রাতে তার বন্ধু-বান্ধবদের আগমনে পরিবেশ জঘন্য হয়ে উঠত। আমি খোলা বারান্দায় শুয়ে থাকতাম। ভেতরে ডাক্তারজী, শ্রীগুরুজীর ছবি লাগিয়েছিলাম, সবকিছু আমার কাছে অসহনীয় ছিল কিন্তু কিছু করার ছিল না। একদিন শ্যামলালদা

আমাকে দেখতে এলেন, সব শুনে বললেন— 'আর একদিনও এখানে নয়।' কার্যকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে ২৫ টাকায় একটি ঘর ভাড়া নেওয়া হলো। এটি ছিল বোলপুরের প্রথম নিবাস। তখন রথীনদা (চক্রবর্তী) ছিলেন বিভাগ প্রচারক।

এক সময় শিশুমন্দির যোজনায় আমাকে শিলিগুড়িতে আসতে হলো। বলতে হয় আমার সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ, বিদ্যার্থী বিস্তারক, শিশুমন্দির যোজনায় আসা--- লক্ষ্ণৌ প্রশিক্ষণে শুনেছি সবকিছুর পেছনে ভাউরাওজীর আশীর্বাদ কাজ করেছিল। এ ছিল আমার পরম সৌভাগ্য। এক সময় পার্বত্য বিভাগের দায়িত্বে শ্যামলালদা শিলিগুড়ি এলেন। কাছে ছিলাম— আবার কাছে এলাম বা কাছে পেলাম। শিলিগুড়ি প্রভাত শাখায় শ্যামলালদা এক মজার নিয়ম করলেন, যে শাখায় অনুপস্থিত থাকবে শাখার পরে সবাই মিলে যাবে তার বাড়িতে, হবে প্রভাতি চা পান। শাখায় সংখ্যা বেড়ে গেল। শ্যামলালদার উৎসাহেই জলপাইগুড়ি পুণ্ডিবাড়ি সারদা শিশুতীর্থ শুরু হয়। আমিও সঙ্গে যেতাম। আপাত রাশভারী মনে হলেও শ্যামলালদা যথেষ্ট কৌতুকপ্রবণ ছিলেন। সঙ্গে যদি বিদ্যুৎদা (দত্ত) জুটে যেতেন তাহলে তো কথাই নেই। একবার বাঁকুড়ায় সঙ্ঘের প্রাদেশিক বৈঠকে রাত্রিভোজনের পরে শ্যামলালদা বিদ্যুৎদা-সহ বেশ কয়েকজনের শুরু হলো মজার মজার গল্প, কৌতুক কথা। হাসির ফোয়ারা চলল। এক সময় কেশবজীও সেখানে এসে যোগ দিলেন, জমাট আসর। হঠাৎ দেখা গেল বসন্তদা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। মুচকি হেসে যেন একটু গম্ভীরভাবে বললেন রাত পৌনে এগারোটা বাজে। এক নির্মল হাসির আনন্দ নিয়ে যে যার বিছানায় চলে গেলেন।

শ্যামলালদার পরিচ্ছন্নতার কথা সর্বজনবিদিত। সেই কৃষ্ণনগরে 'মতিসুন্দরী ভবন' থেকে শিলিগুড়ি নিবাস— সর্বত্রই দেখেছি ঘুরে ফিরে এসে শ্যামলালদা একবালতি কাপড়জামা বা বিছানার চাদর কিছু না কিছু ভেজাবেনই। ইস্তিরি করা ধুতি বা সাদা ফুলশার্ট ছিল শ্যামলালদার চিরদিনের পোশাক। কলেজ পর্যন্ত আমিও ধুতির সঙ্গে ফুলশার্টই পরতাম, শিলিগুড়ি এসে পাঞ্জাবিতে পরিবর্তন। কিন্তু সে প্রভাব যায়নি। এরকম অজস্র কত বিষয়তো প্রভাবিত করেছে, কিন্তু ধরে কতটুকু রাখতে পারলাম। দু'দিন আগে আমার প্রথম শাখার সঙ্গী বন্ধু ধ্রুবকে যখন এই দুঃসংবাদের কথা জানালাম সে বলল— মাটির মানুষ ছিলেন শ্যামলালদা, আমাদের জীবনের অনেকটা অংশ জুড়ে আছেন আজও। এই মুহূর্তে এক বিমূঢ়তা মনকে যেন ঘিরে ধরে আছে। কর্তব্য জ্ঞান যেন এক অচল ভূমিতে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অপরদিকে অব্যক্ত মন-গোচরে এক অনুভূতি যেন বলছে— এই মহান আত্মা সমূহের স্বর্গলাভের জন্য আমার মতো ক্ষুদ্র সাধারণ এক মানুষের আলাদা কোনো প্রার্থনার খুব প্রয়োজন কি আছে! কেশবজী, শ্যামলালদা, বিদ্যুৎদার মতো তপস্বীরা তো স্বীয় তপোবলেই স্বর্গস্থান অধিকার করে নেবেন। আমি শুধু তাদের কাছে প্রার্থনা করি তাঁরা যেন আমার মতো জীবনে ভুল ভ্রান্তির ধূলিমাখা মানুষগুলিকে আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত না করেন। শ্যামলালদা, কেশবজীর চরণে আমার শতকোটি প্রণাম।

বাঁকুড়া শহরে একটি পরিবারে শ্যামলালদা।

পরিচ্ছন্নতার মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. কল্যাণ গৌতম

পরিচ্ছন্নতার মধ্যেই যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, ঈশ্বরকে নৈবেদ্য প্রদানের মধ্যেও যে মিছরির মতো স্বচ্ছ সামগ্রী এবং স্পষ্ট হৃদয় দিতে হয়, তা শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৭-২০২২) তাঁর জীবনচর্যা ও মানসচর্চার মাধ্যমে আমাদের শিখিয়ে গেলেন। আমরা তাঁকে বলতাম 'স্বচ্ছ সঙ্ঘী'। আবর্জনা দূরে সরিয়ে মানুষকে বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলার শিক্ষক। সঙ্ঘকে ভালোবেসে যিনি বলতে পারেন 'স্বচ্ছং স্মরণং গচ্ছামি...।' মোদীজীর স্বচ্ছ-ভারত যোজনার একান্ত সমর্থক ছিলেন তিনি। জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, চিন্তা চেতনায় স্বচ্ছতা। সৌম্যকান্তি স্বচ্ছবর্ণ; নির্মল পোশাক, ক্লেদ মুক্ত জীবন; কালি না মাখা এক প্রচণ্ড আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব; ঈশ্বরের নিত্যপূজারি এবং আদ্যন্ত সেবাব্রতী এক মানুষ।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বঙ্গপর্বের স্তম্ভ, এইরকম কয়েকজন বরিষ্ঠ প্রচারক সম্প্রতি প্রয়াত হয়ে হৃদয়ে বিদারক এক শূন্যতা ও গভীর বেদনা বয়ে এনেছেন। মনমোহন রায়, বিদ্যুৎ দত্ত (১৯৩৪-২০২২), কেশবরাও দীক্ষিত (১৯২৫-২০২২)-এর পর ২৩ সেপ্টেম্বর চলে গেলেন শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৮৭ বছর বয়সে কলকাতার নর্থ সিটি নার্সিংহোমে পরলোকগমন করেছেন দেশভক্ত, সেবা পরায়ণ ও পরিচ্ছন্নতার প্রতীক এই মানুষটি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সাতাশি। প্রায়-শতবর্ষী প্রয়াত কেশবজী ছিলেন তাঁর অন্যতম নির্মাতা এবং প্রেরণাদাতা। উত্তর কলকাতার ১৬ নম্বর কালিকুমার ব্যানার্জী রোডের বাসাবাড়িতে শ্যামলালদা যখন থাকতেন, তখন কেশবজী নিয়মিত তাদের বাড়ি আসতেন। আর তখনই দেশভক্তির দীক্ষা হয়ে যায়। সেটা আনুমানিক পাঁচের দশকের শুরু। শ্যামলালদার বাসাবাড়ির পাশেই ২৩ নম্বরে ছিল স্থানীয় সঙ্ঘ নিবাস। টালাপার্কের ফাঁকা জমিতে নিয়মিত শাখা চলতো। শ্যামলালদা তাঁর খুড়তুতো ভাই তরুণ ও কিরণ, সেজদা রামলাল, মেজদা কৃষ্ণলাল

এবং পাড়ার বন্ধু দিবাকরকে সঙ্গে নিয়ে নিয়মিত শাখায় যেতেন, খেলাধুলা করতেন, দেশসেবার পাঠ নিতেন। এই বাল্য-বন্ধু দিবাকরই শ্যামলালদার সঙ্গে সঙ্ঘের যোগসূত্র রচনা করিয়ে দেন।

১৯৩৭ সালের ২৫ আগস্ট পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরের পালং গ্রামে শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। পিতা বীরেন্দ্রলাল ছিলেন পেশায় আইনজীবী; মা সুদক্ষিণা দেবী। চার ভাইয়ের মধ্যে শ্যামলালদা ছিলেন কনিষ্ঠ। ১৯৩৯ সালে শ্যামলালদার যখন মাত্র দু' বছর বয়স, তখন পূর্ববঙ্গেই তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। ১৯৪৩ সালে প্রতিবেশী বিধর্মীদের অত্যাচারে পিতা বীরেন্দ্রলাল সপরিবারে এপার বাঙ্গলায় চলে আসতে বাধ্য হলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা দক্ষিণারঞ্জন কেবল রয়ে গেলেন পূর্ববঙ্গে, তার মাতুলালয়ে; যদিও পরে তিনিও স্বাধীন ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিলেন। কলকাতার নিমতলায় এলাকায় বাসা ভাড়া নেন শ্যামলালদার পিতা। শ্যামলালদা ভর্তি হলেন নিমতলার স্থানীয় এক বিদ্যালয়ে, তখন তাঁর বয়স ছয় অথবা সাত। পরে এই পরিবার টালা এলাকায় বাসাবাড়ি পরিবর্তন করে এলেন। টালা এলাকা থেকেই শ্যামলালদা শাখায় যেতে শুরু করেন এবং স্বয়ংসেবক হন।

১৯৫৪ সালে শ্যামলালদা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, ১৯৫৮ সালে বি.কম এবং ১৯৬০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.কম পরীক্ষায় পেলেন প্রথম বিভাগ। মেধাবী এই ছাত্র; চাইলে সেই সময় তাঁর দাদাদের মতোই সরকারি উচ্চপদে আসীন হতে পারতেন, সেই ক্ষমতা ও প্রবণতাও ছিল। তাঁর দাদা পরে হয়ে উঠলেন বার্নপুরে স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়ার উচ্চ আধিকারিক, মেজদা হয়েছিলেন প্রভিডেন্ট ফান্ডের চিফ কমিশনার, সেজদা কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেক্রেটারিয়েটের বরিষ্ঠ আধিকারিক। অথচ তাদেরই মেধাবী ছোটোভাই হয়ে গেলেন সঙ্ঘের সন্ন্যাসীসম প্রচারক। দেশকে ভালোবেসে ভারতমাতার গৌরব বৃদ্ধি করতে এবং সমৃদ্ধিশালী ভারত গড়তে সংসার ছাড়লেন। নানান জায়গায় বিস্তারকের দায়িত্ব নিয়ে সলতে পাকানোর কাজ আগেই শুরু করে দিয়েছিলেন (১৯৫৭-৫৮ সালে তিনি সিউড়ি-

রামপুরহাটে দুই স্বয়ংসেবকের সঙ্গে শ্যামলালদা।

দুবরাজপুরের বিস্তারক; ১৯৫৯ সালে কলকাতার শ্যামবাজার এলাকার বিস্তারক; ১৯৬০-৬১ সালে ভবানীপুর, বজবজ, বাটানগর, বিড়লাপুর এলাকার বিস্তারক)। এম.কম পরীক্ষার পর তিনি নিজের জীবন সঁপে দিলেন, যাকে বলা যায় ভারতমাতার কাজে সম্পূর্ণ সমর্পণ। কলকাতার ২৬ নম্বর কার্যালয়ে এসে জীবন তরণীর নোঙর ফেললেন এবং অরবিন্দ ভাগের সায়ম্ বিভাগের বিস্তারকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬১ থেকে ৬৪ পর্যন্ত তিনি ২৬ নম্বরে অবস্থান করেছেন। ১৯৬৪ সাল থেকে শুরু হলো প্রচারকের জীবন। কৃষ্ণনগরকে হেড কোয়ার্টার করে নদীয়ার জেলা প্রচারক হলেন, বিশেষ নজর রইলো নবদ্বীপ এলাকায়; সেখানকার সাধারণ মানুষ, সাধুসন্ত এবং যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্ঘের ভাব-প্রচার করলেন। নদীয়া জেলায় সঙ্ঘের ভিত তৈরি করতে থাকলেন। তখন ওপার বাঙ্গলা বা পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে ছিন্নমূল মানুষের ঢল আসছে, মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েও তাদেরই দোসর এ রাজ্যের একটি পার্টিতে এসে ভিড় ছেন অবুঝ হিন্দু। শ্যামলালদা তাদের চোখ খুলে দিতে শুরু করলেন। ১৯৬৪ থেকে একাদিক্রমে ১২ বছর তিনি নদীয়ার সমাজ জীবনে হিন্দু সংস্কৃতির পরত পুনরায় মাখাতে শুরু করলেন, সঙ্গে রইলো সেবাকাজ, সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ, দেশসেবা, ভারতবোধ।

এরপর তাঁর সাময়িক রাজনৈতিক জীবন। ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থায় তিনি ইন্দিরা সরকারের দ্বারা গ্রেপ্তার হলেন। শুরু হলো জেলজীবন। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তাঁকে জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত হতে হলো।

স্বৈরাচারী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হলো, তাতে মিশে গেল সঙ্ঘ-সম্পৃক্ত ভারতীয় জনসঙ্ঘ। মোরারজী দেশাই মন্ত্রীসভায় যোগ দিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবাণী। রাজনৈতিক কাজের জন্য তাদের কর্মধারায় কাছাকাছি এলেন শ্যামলালদা। সমন্বয়ের কাজে দিল্লিতেও তাঁকে অনেক সময় কাটাতে হয়েছে। এইভাবে ১৯৭৬ থেকে ৮০ পর্যন্ত তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে শামিল হলেন। সংগঠনের অন্যতম দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আরও নিবিড়ভাবে জানতে সক্ষম হলেন তিনি, যা তাঁকে সাংগঠনিকভাবে আরও মজবুত করে তুলেছিল। সমসাময়িক সময়ে ভারতীয় জনতা পার্টি গঠিত হলে (৬ এপ্রিল, ১৯৮০) তিনি পুনরায় সঙ্ঘের কাজে ফিরে এলেন। রাজনৈতিক জীবনের পূর্বে ১৯৭৬ সালে তিনি মালদা জেলা প্রচারক হন এবং উত্তরবঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হন। এবার তাঁকে আরও উত্তরে সংগঠন বাড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হলো। যাকে বলে পার্বত্য বিভাগ, যার হেডকোয়ার্টার শিলিগুড়ি; সেখানে দায়িত্ব নিলেন তিনি। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা নিয়ে এই বিভাগ। উত্তরবঙ্গের আনাচকানাচে ঘুরে ফিরলেন তিনি। একাদিক্রমে আট বছর (১৯৮০-৮৮) সঙ্ঘকাজ সারলেন। দক্ষিণ আগেই চিনেছেন, তারপর উত্তর; এমন মানুষকেই প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ করা হলে, সকালের সঙ্গে সমন্বয় করতে পারবেন, এই বোধে সম্ভবত তাঁকে প্রান্তে আনা হলো। কেশবভবন তখন তৈরি হচ্ছে, ডাক্তারজীর স্মৃতিতে, তাঁর শতবর্ষে (১৮৮৯ সালের ১ এপ্রিল সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজী তথা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের জন্ম)। সেই কাজ দেখভালের দায়িত্ব পেলেন প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ শ্যামলালদা। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব সমালেছেন তিনি। এদিকে ১৯৮৯ সালে রামজন্মভূমি আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে শ্রীরাম শিলা পূজনের সূত্রপাত হয়। অতঃপর ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে অযোধ্যায় বিতর্কিত ধাঁচা অপসারিত করেন করসেবকেরা। তারই ফলশ্রুতিতে সঙ্ঘের উপর নেমে এলো নিষেধাজ্ঞা। অনেক কার্যকর্তাদের সঙ্গে শ্যামলালদাও গ্রেপ্তার হলেন।

১৯৯৪ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি প্রান্ত সেবা প্রমুখের দায়িত্ব পেলেন। এটাই তাঁর সেরা সময় বলে মনে করতেন। মানুষের সেবা করার জন্যই যে তিনি এসেছেন, এই বোধ তাকে ভেতরে-বাইরে প্রেরণা দিত। সেবার কাজ তিনি আজীবনই করেছেন। নানান জায়গায় দুঃস্থ মানুষের জন্য; এমনকী অসুস্থ, বৃদ্ধ, অসমর্থ কার্যকর্তাদের অফুরন্ত সেবাশুশ্রূষা করেছেন, তাদের জামাকাপড় কেচেছেন, তাদের মলমূত্রও পরিষ্কার করেছেন।

১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তাঁকে প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য করা হয়। এরপর ২০০৯ সালে থেকে আমৃত্যু তিনি ছিলেন প্রান্তের আমন্ত্রিত সদস্য। এইভাবে প্রায় তিন দশকের বেশি সময় কেশবভবনে অবস্থানের কারণে তিনি আর ভবন হয়ে গেলেন অভিন্ন। ভবনের পূর্বতন বিল্ডিঙের চারতলার সিঁড়ির বিপ্রতীপে ৩১ নম্বর ঘরটি ছিল তাঁর অভিন্ন হৃদয়ের কক্ষ, তা বলতে সমান আনন্দ পেতেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কেশব ভবনে গেলেই তিনি দর্শনার্থীকে প্রসাদ দিতেন, কুশল বিনিময় করতেন, স্নেহ শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাতেন। ঝকঝকে গণবেশ, টিপটাপ রুচিসম্মত পোশাক—তারই আবরণে সেবা, সহমর্মিতা, সনাতনী প্রচার--- সবমিলিয়ে তাঁকে এক অনুপম ব্যক্তিত্বে পর্যবসিত করেছিল। যার পুরোটাই তিনি সঙ্ঘকে দান করে গেলেন। গত ২৩ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে সাতটায় নর্থ সিটি নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এই সন্ন্যাসীসম মানুষটি। সেই সঙ্গে শেষ হয়ে গেল এক বর্ণময় সৌম্য সৌকর্যের অধিকারী একটি ঘরানা। স্বয়ংসেবক মহলে নেমে এল অমিত শোক। তাঁর আত্মা চিরশান্তিতে থাকুন এই কামনা।

স্মৃতিকণা

আনন্দ মোহন দাস

কেশবজীর স্মৃতিচারণে অনেক কথাই মনে পড়ছে। তবে কেশবজী কত উদার মনের মানুষ ছিলেন তার একটি ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। সেই ঘটনা আজও মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করে ভাসছে। ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আয়োজিত ধর্মসভায় অংশ নেওয়া। সেবার সঙ্গমে পুণ্য স্নানের জন্য বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম হয়েছিল। হাওড়া হুগলী বিভাগের তদানীন্তন সঙ্ঘচালক ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহারাজও (জ্যোতিদা) প্রয়াগে গিয়েছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গী ছিলাম। কুম্ভ শেষে আমাদের মুম্বাই-হাওড়া ভায়া এলাহাবাদ মেলে টিকিট কনফার্ম না থাকলেও প্রধান শিক্ষক জ্যোতিদার স্কুলে বিশেষ কাজ থাকায় টিটির অনুমতিক্রমে কোনো এক সংরক্ষিত কামরায় ভিড়ের মধ্যে এলাহাবাদ স্টেশনে উঠতে বাধ্য হয়েছিলাম। কামরায় এত ভিড় ছিল যে শোয়া তো দূরের কথা, বসার জন্য কোনো জায়গা ছিল না। হঠাৎ দেখি ভিড়ের মধ্যে কেশবজী জ্যোতিদাকে ডাকছেন। অমল কুমার বসুও (অমলদা) কেশবজীর সঙ্গে ওই কামরায় ছিলেন। উভয়ের কনফার্মড টিকিট ছিল। কেশবজী সারারাত জেগে নিজের সংরক্ষিত আসন হাসিমুখে জ্যোতিদার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিজে কষ্ট স্বীকার করেও নিজের আচরণের মধ্য দিয়ে তাঁর মহানুভবতা প্রকাশ করেছিলেন। ছোটো ঘটনা হলেও তাঁর আচরণ সেদিন আমাকে খুবই মুগ্ধ করেছিল। আমি বিশ্বাস করি কেশবজী সমস্ত স্বয়ংসেবকের কাছে চির অমর হয়ে থাকবেন।

কেশবজীর জন্মদিনে কেশব ভবনে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত।

বঙ্গভূমিতে সারাটি জীবন কাটিয়ে গেলেন কেশবজী

প্রদীপ ঘোষ

বাঙ্গলায় সঙ্ঘের ভীষ্মাচার্যের প্রয়াণ ঘটলো। প্রবীণতম প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত চলে গেলেন। তিনিই বাঙ্গলায় শেষ মারাঠি প্রচারক। বর্তমানে বাঙ্গলায় আর কোনো মারাঠি প্রচারক নেই। কেশবজী কলকাতায় সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে আসেন ১৯৫০ সালে, তখন আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র। তখন থেকে পরিচয়, দীর্ঘ ৭২ বছরের সম্পর্ক। কেশবজী যখন বাঙ্গলায় আসেন তার কিছুদিন আগেই নেহরু আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পরে সঙ্ঘ নতুন উদ্যমে বিস্তার লাভ করছিল। এই সময় কলকাতায় সাত-আটজন মারাঠি প্রচারক ছিলেন। ভালচন্দ্র গোখলে ও কেশবজী ছাড়া বাকিরা ফিরে যান। গোখলেজীরও বদলি হয়। বাঙ্গলায় সেই সময় প্রতি জেলায় দু'তিনজন প্রচারক ছিলেন। সঙ্ঘের কাজ দ্রুত গতিতে বাড়ছিল। কেশবজী আসার পরই তাঁকে বড়বাজারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেখানে তিনি খুব ভালো সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য পঞ্জাব ও রাজস্থান থেকে আগত কিছু কার্যকর্তাও ছিলেন। তখন লোকে সঙ্ঘ বলতে বড়বাজারকেই জানত। কেশবজীর হাতে গড়া সেই কার্যকর্তারা প্রায় সবাই লোকান্তরিত। তাদের পুত্র, প্রপৌত্ররা এখন কাজের দায়িত্বে। সেদিন রাত্রে নিমতলা মহাশ্মশানে যে শ্মশানবন্ধুদের দেখা গেল এরা তারাই। কেশবজী তাদের পিতৃব্যসম।

প্রথম থেকেই বড়বাজারে থাকার জন্য কেশবজী দীর্ঘদিন বাংলা শেখেননি। আমাদের সঙ্গে অনেকদিন হিন্দিতেই কথা বলতেন, পরে খুব ভালো বাংলা শিখেছেন। চেহারা ছিল রাজপুত্রের মতো। শারীরিক কার্যক্রমে অত্যন্ত দক্ষ। আমরা সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে তাঁকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম। পরবর্তীকালে যখন সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি তখনও তিনি আমাদের সঙ্গে শিক্ষক হিসেবে থাকতেন। ষাটের দশকের সম্পূর্ণটা এইভাবে আমাদের সময়টা কেটেছিল। তখন যাঁরা সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের শিক্ষক, প্রবন্ধক থাকতেন তাঁরা আজ আর কেউ নেই, একমাত্র আমি, ডাক্তার চিন্ময় শীল ও রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া। সেই আনন্দময় যুগের স্মৃতি আজও সজীব। সঙ্ঘের যে সমৃদ্ধিময় সময়কালে কেশবজী বাঙ্গলায় এসেছিলেন ধীরে ধীরে কেন জানি না তার পরিবর্তন ঘটতে থাকলো। পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের কাজ ক্রমশ কমতে থাকল। আর্থিক অসুবিধার জন্য প্রচারকদের স্বউপায়ে অর্থ উপার্জন করতে বলা হলো। অনেকেই ছোটোখাটো কাজ শুরু করলেন। শুনেছি তখন দীর্ঘ দুই বছর প্রচারকদের কোনো বৈঠক হয়নি কারণ রাহা খরচ দেওয়া সম্ভব ছিল না।

১৯৫৯ সালে আমি যখন প্রচারক হই তখন পশ্চিমবঙ্গে ১৫ জন প্রচারক ছিলেন। শুনলে অবাক লাগবে যে প্রান্তের প্রচারকদের বৈঠক হতো ২৬ নম্বরের হলঘরে। আমরা গোল হয়ে বসতাম। সেই সময়েরও সাক্ষী কেশবজী। পরবর্তীকালে কেশবজীকে ধীরে ধীরে প্রান্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তিনি তা সার্থকভাবে পালন করেন। দীর্ঘদিন প্রান্ত প্রচারক থাকার কারণে বাঙ্গলায় প্রতিটি জেলার গ্রামে গ্রামে স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিতি হয়েছিল। কোনওদিন গুরুগম্ভীর বিষয়ে জ্ঞান সমৃদ্ধ অর্থাৎ অ্যাকাডেমিক ভাষণ তাঁকে কখনো দিতে দেখিনি কিন্তু অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে বক্তব্য রেখে তিনি মানুষের মন জয় করতে পারতেন। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। অত্যন্ত সরস প্রকৃতির লোক ছিলেন কেশবজী। তিনি যেখানে থাকতেন সেখানে সব সময়ই নানা কৌতুককর বিষয় উত্থাপন করে সকলকে আনন্দ দিতেন। তিনি আছেন অথচ হাসাহাসি হচ্ছে না এটা ভাবাই যেত না। তাঁর সাফল্যের আরেকটি কারণ তিনি বাঙ্গলার মনন অর্জন করতে পেরেছিলেন। বুদ্ধি নয়, হৃদয় নিয়েই ছিল তাঁর কাজ। কথায় বলে বাঙ্গালি রোদনপ্রিয় জাতি। বাঙ্গলার মাছকে খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে আনার সঙ্গে সঙ্গে এই রোদনপ্রিয়তাও তাঁর মধ্যে দৃশ্যমান হয়েছিল। শ্রদ্ধানন্দ পার্ক শাখার স্বয়ংসেবক সঞ্জয় নন্দী (বর্তমান ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দীর অগ্রজ) এম কম এবং ল' পাশ করার পরে তাঁর অনুপ্রেরণায় প্রচারক হন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই দুরারোগ্য

অন্তিম শয্যায় শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পূর্বতন সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী।

ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে প্রচারক থাকাকালীনই তাঁর নিজ বাড়িতে তিনি পরলোকগমন করেন। কেশবজীকে তখন বালকের মতো ক্রন্দন করতে দেখা গিয়েছিল। বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক এবং পুরাতন স্বয়ংসেবক বাদল ভট্টাচার্যের মৃতদেহ যখন বিজেপি কার্যালয়ে আনা হয় তখন ছবিতে দেখেছি পরম আদরে তার দু' গালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন কেশবজী। আমার শিবাজী উৎসব কবিতা আবৃত্তি শুনে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে দেখেছি।

তিনিই বোধহয় একমাত্র প্রচারক যিনি সঙ্ঘের পাঁচজন সরসঙ্ঘচালকেরই নিকট সম্পর্কে এসেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন সঙ্ঘের প্রচণ্ড সমর্থক। পরে স্থানীয় সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর চেষ্টাতেই কোনো একটি স্থানে সঙ্ঘের শাখা শুরু হয় এবং সেখানে ডাক্তারজীর উপস্থিতিতে বালক কেশব প্রার্থনা বলেছিল। কেশবজীর জীবনে তাঁর পিতার বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি শাখায় যাবার জন্য, সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে যাবার জন্য তাঁকে উৎসাহ দিতেন। একবার ডাক্তারজী তাঁর পিতাকে বলেছিলেন আপনার তো আরও ছেলে আছে আপনি এই ছেলেটিকে আমাকে দিন। তার জবাবে তিনি বলেছিলেন ওতো আপনারই ছেলে, আপনি নিয়ে যাবেন তাতে বলার কী আছে।

কেশবজী একটি ঘটনার কথা একবার বলেছিলেন, রাতে খাবার সময় তাঁর বাবা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন কেশব আজ সূর্য নমস্কার করেছ? উনি বললেন না। তখন তিনি খাওয়া বন্ধ করে ওখানে কেশবজীকে সূর্য নমস্কর করালেন, মায়ের অনুরোধ শুনলেন না। এইসব ঘটনাগুলি কেশবজীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল পুনেতে গিয়ে তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা করার, মাধবদা আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁর বাবা-মা, দিদি, ভগ্নীপতি, অন্যান্য ভাই-বোনদের সঙ্গে সেখানে দেখা হয়। ২৬ নম্বরে যখন তাঁর পিতার মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছায় তখন আমাদের খাওয়াদাওয়া চলছিল, মনে আছে কেশবজী কিছুক্ষণ কাঁদছেন আবার কিছুক্ষণ খাচ্ছেন। এই দৃশ্য আজও আমার মনে পড়ে। যেরকম বলা হলো বাঙ্গলার সঙ্ঘের পতন- অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা কেশবজী দেখেছিলেন। সঙ্ঘের সুদিন, পরবর্তী দুর্দিন এবং আবার সঙ্ঘের পুনরুত্থান, সবই তাঁর সামনে ঘটেছে। এই অভিজ্ঞতা বোধহয় আর কারোরই হয়নি। একবার তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, সেরে ওঠার পর তাঁর স্বাস্থ্য ও বয়সের কথা ভেবে তাঁকে সক্রিয় কাজ থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয় এবং সঙ্ঘের অধিকারীদের পরামর্শে তিনি পুণেতে চলে যান এবং সেখানকার কার্যালয়ে থাকতে শুরু করেন। তাঁকে সেখানে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল যাতে তিনি পরিচিত পরিবেশে শেষের দিনগুলি ভালো ভাবে কাটাতে পারেন, কিন্তু কেশবজী কিছুদিনের মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে অধিকারীদের জানালেন ওই পরিবেশে তিনি খাপ খাওয়াতে পারছেন না, বাঙ্গলাতে তাঁর সারা জীবন কেটেছে বাকি দিনগুলি বাঙ্গলার কার্যকর্তাদের মধ্যে থেকে তিনি কাটাতে চান। সেই অনুযায়ী তাঁকে আবার কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হলো। প্রবীণ প্রচারক হিসেবে তিনি থাকলেন, কোনো নির্দিষ্ট দায়িত্ব না থাকা সত্ত্বেও তাঁর উপস্থিতি স্বয়ংসেবকদের কাছে উৎসাহ প্রদানকারী বলে মনে হতো। মাঝে মাঝে তাঁর সংক্ষিপ্ত ভ্রমণও হতো। কয়েক বছর আগে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির বিভাজন হয়। কেশবজীর ভাইয়েরা তাঁর প্রাপ্য বাবদ তাঁকে টাকা পাঠান। কেশবজী ওই সম্পূর্ণ টাকা গুরুদক্ষিণা হিসেবে প্রদান করেন। অর্থাৎ তন সে, মন সে, ধন সে, তন-মন-ধন-জীবন সে। তুলসীদাস বলেছেন, 'তুলসী জব জগমে আয়ে জগ হাসে তুম রোয়ে, অ্যায়সা করনি কর চলো কি তুম হাসে জগ রোয়ে।' মনে হয় তুলসীদাসের কথা কেশবজী সত্যিকারের অর্থে পালন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধৃত করে আমার লেখা শেষ করছি।

দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তবে মঙ্গল-আলোক
তবে তাই হোক।
মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক
তবে তাই হোক।
পূজার প্রদীপে তব জ্বলে যদি মম দীপ্ত শোক
তবে তাই হোক।
অশ্রু আঁখি পরে যদি ফুটে ওঠে তব স্নেহ চোখ
তবে তাই হোক।।

(লেখক পূর্বতন প্রচারক)

কেশবজীর উপস্থিতি আমাদের হৃদয়ে সদা জাগ্রত

তিলক রঞ্জন বেরা

আমি ১৯৬৮ সালে যখন শাখায় এলাম তখন কেশবজী বাঙ্গলায় কাজের মধ্যগগনে। চার বছর পরেই শিলিগুড়িতে প্রথম বর্ষ করলাম। বয়সে ও পরিচিতিতে নবীন এবং সংখ্যাও প্রচুর। তার উপর তিনি কলকাতার কাজের দায়িত্বে। প্রান্ত প্রচারক বসন্তদা, বিভাগ প্রচারক অনন্তদা। তাঁদের সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠতা। সেই বছরই কলেজেও প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার কারণে মেদিনীপুর শহরে আসি। প্রথম বর্ষ বর্গে দু'-একবার কেশবজীকে দেখার সুযোগ হয়েছে। পরের তিন বছরে দেখা হয়েছে কিনা মনে নেই। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর মেদিনীপুরের কাজকর্ম দেখতেন অনন্তদা ও ধর্মদা। বসন্তদা দুবার কলকাতায় গোপনে ডেকেছিলেন। কেশবজী প্রথম থেকেই অন্তরালে। মনে হয় কেন্দ্রীয় নির্দেশে অন্য প্রদেশে চলে গেছলেন। পুজোর পর অক্টোবর মাসে হঠাৎ মেদিনীপুর শহরে হাতে অ্যাটাচি ব্যাগ নিয়ে এক ঝলক দেখলাম। পরনে প্যান্ট শার্ট, ফরসা চেহারা। খুব একটা বেশি কথা বললেন না। মনে হয়, প্রবীণ স্বয়ংসেবক লহর মজুমদার, লক্ষ্মী সেনের সঙ্গে কথা বলে চলে যাচ্ছেন। মনোরঞ্জন কবি তখন জেলে।

জরুরি অবস্থা উঠে গেল। কেশবজী প্রান্ত প্রচারক হলেন। আমিও কলকাতায় পড়তে গেলাম ১৯৭৭-এর জানুয়ারি মাসে। ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা। সত্যিকারের তাঁকে চিনলাম ১৯৮০ সালে মালদা দ্বিতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে। তখন আমিও খানিকটা পরিণত। আজও কেশবজীর কর্ম তৎপরতার দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে। ভোর তিনটায় উঠে দেখেছি কেশবজী রান্নাঘরে উনুন ধরানোর কাজে সাহায্য করছেন। দুপুরে বৌদ্ধিকের সময় কোনো শিক্ষার্থী ঘুমিয়ে আছে কিনা খোঁজ করেছেন। বৌদ্ধিকের সময় গান ঠিক হলো কিনা, বিকেলে মাঠে শারীরিকেও সমান নজর। ১৯৮১-র পর থেকে সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও অনেক আন্দোলনমুখী কার্যক্রম। আমি তখন জেলা কার্যবাহের দায়িত্বে। ১৯৮৩-তে একাত্মতা রথযাত্রার কার্যক্রম। ১৯৮৬ সালের পর থেকে রামমন্দির আন্দোলন, ১৯৯২-এর কল্যাণী মহাশিবির। সব ব্যাপারেই তাঁর সাহচর্য, উপস্থিতি পেয়েছি। আদেশ, উপদেশ, সক্রিয় অংশগ্রহণ, সজীব নেতৃত্ব নজর কাড়ার মতো। ১৯৮৩-৮৪ সালে দু-বছরের জন্য পূর্বক্ষেত্রের সহক্ষেত্র প্রচারকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন (বিহার-সহ), পরে আবার বাঙ্গলায় কাজের সঙ্গে যুক্ত হন।

প্রচারকদের মাঝে কেশবজী। পাশে মোতালগজী।

কেন্দ্র বরাবরই কলকাতায়। প্রথমে ২৬নং বিধান সরণি, পরে কেশব ভবন। শরীর স্বাস্থ্য বরাবরই উপর থেকে দেখতে ভালো, কিন্তু বেশ কিছুদিন পরে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। একবার খড়্গপুর থেকে কলকাতা যাওয়ার সময় ট্রেনেই অসুস্থ হয়েছিলেন। তারপর থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করতেন। প্রচারক জীবন ৭২ বছরের। ১৯৭৫ পর্যন্ত কলকাতার দায়িত্ব। পরে প্রান্ত প্রচারক। তাই শেষদিন পর্যন্ত বাঙ্গলার সমস্ত স্বয়ংসেবকদের এমনকী পরিবারের সকলের মনে স্থান করে নিয়েছিলেন। যতদিন শরীর সায় দিয়েছে স্বয়ংসেবকদের আহ্বানে জোর করে ভ্রমণ করেছেন। শেষের দিকে কলকাতায় নিজের বিছানায় বসেই সকলের সঙ্গে মন খুলে গল্প করতেন। কারও সঙ্গে বাবার মতো, কারও সঙ্গে দাদুর মতো। সবাই এখানে এসে দেখা করে মনে শান্তি পেত। তিনি হাসি মজাও করতেন। তাঁর মধ্যেও সমাজের বাস্তব রূপ ফুটে উঠত। সঙ্ঘের আদর্শও তুলে ধরতেন। বেশি দিনের কথা নয়। কেশব ভবন নবকলেবরের ঠিক আগে। কার্যালয়ে অনেকেই আছেন, কেশবজী সবার সঙ্গে মজা করছেন, আমিও কোনো কাজে গেছি। হঠাৎ চা নিয়ে একজন নবীন বিস্তারক স্বয়ংসেবক এল। কেশবজী জিজ্ঞেস করলেন— তুমি কে? সে নাম বলল। তুমি ভবনে কেন? সে বলল, বিস্তারক বেরিয়েছি, স্থান ঘোষণা হয়নি, তাই বিদ্যুৎদা (প্রান্ত প্রচারক) বললেন, ভবনে কাজকর্ম কর ও সঙ্ঘ ভালো করে বোঝ। কেশবজী প্রশ্ন করলেন— সঙ্ঘ বুঝেছ? সে কোনো উত্তর দিল না। কিছুটা ভয় ছিল, সঙ্কোচ ছিল, তাছাড়া উত্তরও জানা ছিল না। সবাই চুপ, কেশবজী নিজেই বললেন— 'পারবে না, সঙ্ঘ বুঝতে পারবে না। আমিও পারিনি'। সঙ্গে সঙ্গে আমি জোর দিয়ে বললাম, আপনি বুঝতে পারেননি— এটা অনুভব করতে আপনার এতোদিন লাগল। পঞ্চাশ বছর আগে বুঝলে আপনি বাঁচতেন এবং আমরাও। সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

তিনি একটু রাসভারী ছিলেন। আমরা শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। স্বস্তিকার জন্মলগ্ন থেকেই তিনি স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের মধ্যে ছিলেন। আমি যুক্ত হয়েছি ২০১৭ সালের পর থেকে। তিনি কেশব ভবনে প্রভাত শাখায় আসতেন, নিজে সামুহিক গান ও সুভাষিতম্ করাতেন। গীতা পাঠ করাতেন। কেশবজীর সংস্কৃত উচ্চারণ খুব শুদ্ধ। অর্থও বোঝাতেন। অনেক কথা বলার আছে। সব মিলিয়ে শরীরে না থাকলেও তাঁর উপস্থিতি আমাদের হৃদয়ে সদা জাগ্রত। ■

আমাদের কেশবজী

বিজয় আঢ্য

কেশবজী আপনি শেষ পর্যন্ত 'জী'-ই রয়ে গেলেন। বাঙ্গালি আর হতে পারলেন না— মজা করে কেশবজীকে একজনের প্রশ্ন। কেশবজী একটু মিটমিট করে হেসে প্রশ্নকর্তার উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন— কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি মনীষীর নাম বলতো?

স্বামীজী।

আর একজনের নাম বলো?

কেন, নেতাজী।

একটু মৃদু হেসে কেশবজী বললেন, আমি কেশবজী।

হো হো করে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। পঁচিশ বছর বয়সে বাঙ্গলায় এসেছেন। এরপর বাহাত্তরটা বসন্ত পার হয়ে গেছে। কেশবজী আদ্যন্ত বাঙ্গালি হয়ে গেছেন। চলনে-বলনে, পোশাক-পরিচ্ছদে পুরো দস্তুর বাঙ্গালি। তিনি যে আদতে মহারাষ্ট্রের মানুষ কেউ বলে না দিলে তা বোঝা যাবে না। আসলে কেশবজী একেবারে আমাদের ঘরের মানুষ হয়ে গেছিলেন। অনেকের পরিবারে একেবারে রান্না ঘর পর্যন্ত। কয়েকজনের পরিবারের অভিভাবকও।

এরকম এক ব্যক্তিত্বের চলে যাওয়া, তাঁর যতই বয়স হোক না কেন, একটা রিক্ততা আমরা অন্তত বাঙ্গলার স্বয়ংসেবকরা অনুভব করছি। তবুও আমাদের হিন্দু পরম্পরায় 'শোক'-এর স্থান নেই, যা আছে তা তর্পণের। প্রয়াত ব্যক্তির অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হলো প্রকৃত তর্পণ। এই বঙ্গাব্দের (১৪২৯/২০২২ খ্রি.) পিতৃ পক্ষে কেশবজীর সঙ্গে আরও একজন প্রবীণ প্রচারক শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা হারিয়েছি। স্বর্গীয় কেশবজীর মরদেহে ম্যাল্যার্পণ করে সজল চক্ষে তিনি যখন বেরিয়ে আসছেন— কে জানতো এই দেখাই তাঁকে আমার শেষ দেখা। মাঝে দুটো দিন বাদ দিয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর সকালে তিনিও কেশবজীর সঙ্গী হলেন। এ প্রসঙ্গে আরও একজনের কথা উল্লেখ করতে হয়। মাত্র কয়েক মাস আগে বাঙ্গলায় সঙ্ঘের আরও একজন প্রবীণ প্রচারক বিদ্যুৎ দত্ত ইহলোক ত্যাগ করেছেন। আমরা যারা একটু পুরানো স্বয়ংসেবক তারা কেশবজী- বিদ্যুৎদা-শ্যামলালদা— এই তিনজনকে একটা জুটি হিসেবে খোশগল্প করতে দেখেছি। তা এই ত্রয়ী প্রায় একসঙ্গে জুটি বেঁধে পরলোকে পাড়ি দিলেন।

এই নিবন্ধ মূলত স্বর্গীয় কেশবজীর স্মৃতি-তর্পণ। তাই তাঁর স্মৃতি নিয়েই কয়েকটি কথা বলার প্রয়াস। আমেরিকায় কর্মরত প্রবাসী ছোটো ভাইয়ের ডাকে তিনি সেদেশে গেছিলেন। সেখানে হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়-আলাপও হলো। যখন তাঁরা জানলেন যে কেশবজী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীরও সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তখন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর পদধূলি গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ১৯৩০ সালে জঙ্গল সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার পুলগাঁওয়ে গেছিলেন। সত্যাগ্রহীদের স্বাগত জানানোর জন্য যে কমিটি গঠিত হয়েছিল, কেশবজীর বাবা দত্তাত্রেয়জী সেই সমিতির একজন সদস্য ছিলেন। সেই সূত্রেই ডাক্তারজীর সঙ্গে দত্তাত্রেয়জীর ঘনিষ্ঠতা এবং শেষপর্যন্ত পুলগাঁওয়ের সঙ্ঘচালক হিসেবে নিযুক্তি। একদিন গল্পচ্ছলে বালক কেশবকে দেখিয়ে ডাক্তারজী বললেন, দত্তাত্রেয়জী, আপনার তো তিন ছেলে, এই ছেলেটাকে আমাকে দিয়ে দিন। কথায় কথায় দত্তাত্রেয়জীও বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, নিয়ে যান না।' একদা যা ছিল কথার কথা, পরে সেটাই হয়ে উঠল বাস্তব। কেশব বড়ো হয়ে সঙ্ঘকাজেই তাঁর সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন।

বাবার যেহেতু বদলির চাকরি তাই লেখাপড়াও হয়েছিল কোনও একটা নির্দিষ্ট স্থানে নয়। মারাঠি ও সংস্কৃত নিয়ে স্নাতক। ১৯৪৭-এ সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষের প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রচারক। সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে প্রথম নিযুক্তি মহারাষ্ট্রের জলগাঁওয়ে। তার পর ১৯৫০-এ বাঙ্গলায়। বাঙ্গলা ও অসম-সহ সঙ্ঘের যে তৎকালীন সাংগঠনিক ক্ষেত্র, ক্ষেত্র প্রচারক হিসেবে তখন দায়িত্বে ছিলেন একনাথ রাণাডে, যিনি পরবর্তীকালে কন্যাকুমারীর শেষ শিলাখণ্ডে বিবেকানন্দ মূর্তি প্রতিষ্ঠার রূপকার। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্রের কাজ দৃঢ় করার জন্য প্রচারক হিসেবে তিনি যাঁদের নিয়ে

এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেশবজী একজন। তখন তাঁর বয়স পঁচিশ। দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ এক তরতাজা যুবক। কালো হাফপ্যান্ট পরিহিত বাইকে সওয়ারি এক যুবক। 'পহেলে দর্শনধারী পরে গুণবিচারি' সূত্র অনুসারে প্রথম দর্শনেই তিনি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু গুণের বিচারেও অন্তত সঙ্ঘের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি 'অলরাউন্ডার'। শারীরিক ঘোষ (বাদ্য), গান, বৌদ্ধিক (ভাষণ) নানা দিকেই তিনি পারদর্শী। ১৯৬৩ সালে যে বছর বর্ধমান শহরের মহন্তস্থলে প্রথমবর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ করি, তিনি সেই বর্গের মুখ্য শিক্ষক। যেদিন প্রচারক যাত্রা শুরু হয়, সেদিনও চারচাকার সারথি কেশবজী।

স্বস্তিকার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রচার প্রতিনিধি সম্মেলনে কেশবজী।

দু'পাশে দুজন— বসন্তরাও ভট্ট (যিনি টানা ১৭ বছর বাঙ্গলার প্রান্ত প্রচারক ছিলেন) আর মাধবরাও বনহাট্টি (যিনি ১৯৪৬-এ বাঙ্গলায় এসেছিলেন)। এই ত্রয়ীর আশীর্বাদধন্য হিসেবে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে হয়।

কেশবজী যখন (১৯৫০) বাঙ্গলায় এসেছিলেন তখন সঙ্ঘের খুব দুঃসময়। গান্ধী হত্যার অভিযোগে সঙ্ঘের উপর সরকারি নিষেধজ্ঞা তখন সবে প্রত্যাহৃত হয়েছে। আর্থিক অবস্থা এমনই, প্রচারকদেরও বলতে হচ্ছে, বাড়ি ফিরে যান অথবা নিজেরটা নিজেই সামলান। সাধারণ মানুষের ধারণা— সঙ্ঘ গান্ধী মারার দল। কেশবজীর কাছ থেকেই শোনা— কলকাতায় শ্রীগুরুজীর উপস্থিতিতে নাগরিক বৈঠক ডাকা হয়েছে। উপস্থিত মাত্র একজন এবং তিনি আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষ যিনি পরবর্তীকালে ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি হয়েছিলেন। এইরকম এক পরিস্থিতিতে কলকাতার বড়বাজার এলাকায় কাজের জন্য কেশবজী নিযুক্ত হলেন। ঘটনা হলো, কেশবজীর প্রচারক জীবনের সবসময়ই কেন্দ্র ছিল কলকাতা। মহানগর, সম্ভাগ, সহ-প্রান্ত, প্রান্ত, সহ-ক্ষেত্র— প্রচারক হিসেবে সব দায়িত্বই সামলেছেন কলকাতাকে কেন্দ্র করে। দেহত্যাগও কলকাতায়। পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থীদের স্রোত, কংগ্রেসি শাসন, নকশাল আন্দোলন, জরুরি অবস্থা, বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনকাল, সাঁইবাড়ি ও মরীচঝাঁপিতে নিষ্ঠুর হত্যালীলা, রামমন্দির আন্দোলন, ইদানীংকালের শাসককুলের বদলের পরিবর্তে বদলার রাজনীতি— বাঙ্গলার সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের ট্রাস্টিও। পশ্চিমবঙ্গের সব শহর তো বটেই, এমনকী খুব কম ব্লক আছে যেখানে তাঁর পদচিহ্ন পড়েনি। বহু মানুষ তাঁর গুণমুগ্ধ। সকলকে আপন করায় তিনি স্বভাবসিদ্ধ। তবুও তিনি তো রক্তমাংসেরই মানুষ। তাঁর যে অভিমান ছিল না এমন নয়।

কেশবজী একটা বিষয়ে খুব 'সেনসিটিভ' ছিলেন। তা ছিল 'পবিত্রতা'। সমাজের কাজে যারা ব্রতী, তাদের প্রত্যেকেরই আর কিছু থাক বা না থাক, প্রথমে পবিত্র হতে হবে। মনে আছে, একবার বসিরহাটে প্রচারকদের একটা ছোটো গ্রুপের সঙ্গে বৈঠকে মনের শুদ্ধতা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, বারবার উচ্চারণ করতে হবে—

'তস্মৈ মনহা, শিব সংকল্প মস্তু।' বস্তুত শ্রীগুরুজীর ভাষণ যারা শুনেছেন, বিশেষত শেষ দশ বছরের, প্রায় প্রতিটি বৌদ্ধিকে 'অন্তর্বাহ্য শুদ্ধ হোনা চাহিয়ে' কথাটি শুনেছি। এখন যেমন সঙ্ঘে নির্দিষ্ট ভোজন মন্ত্র আছে, একসময় তা ছিল না। সে সময় প্রথমে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৫ ও ৬৬ শ্লোক এবং ৯ অধ্যায়ের ৩০ ও ৩১ শ্লোকটি মিলিয়ে বলা হতো। অর্থাৎ চলার পথে কারোর যদি পদস্খলনও হয় তাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই, শ্রীভগবানের স্মরণ নিলে শীঘ্রই সে এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পাবে। যে সময়ের কথা বলছি, তখন সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে কেশবজী নিজেই ভোজন মন্ত্র বলতেন ও বলাতেন। বস্তুত গত শতকের শেষ চার দশকে বাঙ্গলায় বড়ো বড়ো কার্যক্রমের ব্যবস্থা বিভাগের অনেকটাই দায়িত্ব সামলাতেন কেশবজী ও গজাননদা।

একবার কথা প্রসঙ্গে কেশবজী একজন স্বয়ংসেবককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ— শাখা না সম্পর্ক? ভালোবাসাই সঙ্ঘ কাজের ভিত্তি— এই বিশ্বাসে সে বলল, সম্পর্ক। কেশবজী অবশ্য কোনও প্রত্যুত্তর দিলেন না। কিন্তু সম্পর্ককে 'ইন্টেনসিভ' লাভ বা নিঃস্বার্থ প্রেমে উত্তরণের যে পদ্ধতিটি সঙ্ঘ বেছে নিয়েছে তার নাম শাখা। শাখা যেন 'Purity drilling Mechine'। এক সামান্য ব্যক্তিও রাষ্ট্রহিতের জন্য সর্বস্ব সমর্পণের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। এই বোধের ফলেই কেশবজী নিজেই গান রচনা করেছিলেন—

সঙ্ঘ মানে শাখা/শাখা মানে কার্যক্রম।
নিত্য শাখায় এসে মোরা/করব হিন্দু সংগঠন।

এই গানের অন্তর্নিহিত অর্থটি অনুধাবন করে যদি আমরা নিজেদের জীবন রচনা করতে পারি, তাহলেই কেশবজীর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে।

কেশবজী সদা স্বয়ংসেবকদের মনের মণিকোঠায় বিরাজ করবেন

শম্ভুনাথ ধাড়া

আমার সঙ্গে জরুরি অবস্থার সময় পিজঁরাপোল সোসাইটিতে প্রথম দেখা। একজন সাহেব মনে হচ্ছিল। তখন সদ্য জেল থেকে বেরিয়ে পিজঁরাপোল লিলুয়াতে একজন ভেটেরিনারি ডাক্তারের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করছিলাম। ওখানেই কেশবজীর সঙ্গে পরিচয় হয়।

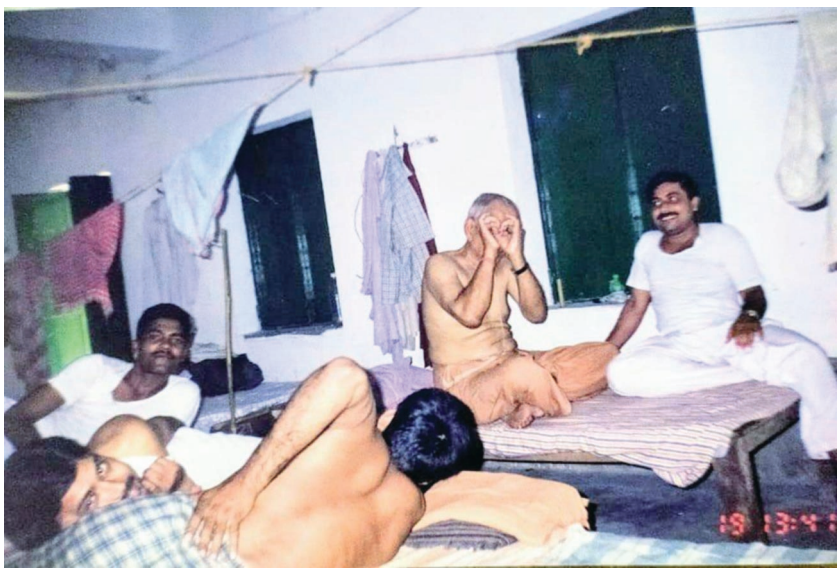

প্রচারকদের সঙ্গে হাসি-মজায় মশগুল কেশবজী।

কেশবজী প্রথম বড়বাজার সায়ম্ বিভাগের নগর প্রচারক হিসেবে কলকাতায় কাজ শুরু করেন। তারপর ধীরে ধীরে প্রান্ত প্রচারক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সঙ্ঘ শাখার প্রদীপ জ্বালানোর প্রেরণা দিয়েছেন। আমি ১৯৮১ সালে প্রচারক বেরিয়েছিলাম। আমাকে সম্পর্ক প্রমুখ গণেশদা বহরমপুর নগর প্রচারক হিসেবে নিয়ে গেলেন।

এক সময় বহরমপুর থেকে অসুস্থ হয়ে ২৬নং বিধান সরণীতে এলাম চিকিৎসার জন্য। সুস্থ হয়ে ওঠার পর আমাকে আর প্রত্যক্ষ সঙ্ঘ কাজে পাঠানো হয়নি। অসুস্থ অবস্থায় একদিন রাতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। কেশবজী প্রতি রাতে আমার খোঁজ নিতেন। সেদিন বললেন— শম্ভু কষ্ট হচ্ছে খুব?

সুস্থ হওয়ার পর প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ রোহিণীদার সহকারী হিসেবে আমাকে দায়িত্ব দিলেন। প্রথম টুকিটাকি কাজ করতে করতে একেবারে জড়িয়ে দিলেন ২৬নং-এর সঙ্গে।

কেশবজীর মুখে শোনা একটা ঘটনা আজও আমার মনকে নাড়া দেয়। তখন একনাথজী ক্ষেত্রীয় প্রচারক। ২৬নং কার্যালয়ে ৩/৪ জনের জন্য একটা ছোটো তিজেল হাঁড়িতে রান্না হতো। ডাল, বড়োজোর আলু ভাতে। একবার ২৬নং-এ কিছুই ছিল না। না চাল না ডাল। একনাথজীর খুব চিন্তা আজকে কী খাওয়া হবে। একটা কানাকড়ি নেই। সবাই চিন্তিত। এমন সময় প্রভাকর লাখে (নাগপুর থেকে বাঙ্গলায় আসা প্রচারক) দরজায় পা দিয়েছেন, অমনি একনাথজী মারাঠি ভাষায় বললেন— তোমার কাছে টাকা আছে? প্রভাকরজী বললেন আছে। একনাথজী বললেন দাও আগে। টাকা দিতে চাল, ডাল আনিয়ে সে বেলার রান্না হলো। সকলের খাওয়া জুটল।

কেশবজী থাকতেন ৮ বাই ১০ একটি ছোটো ঘরে। সেখানে দুটি খাট ৩ বাই ৭ মাপের। সামনে ছোটো একটা টুলে থাকত টেলিফোন আর টেলিফোন ডায়েরি। ওখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হতো সারা রাজ্যের সঙ্ঘকাজ। ওই ঘরেই নানান কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকরা আসতেন। কেশবজীর একটি ছোটো ব্যাগ, তাতে বড়োজোর দু-তিনটি জামা-কাপড়। জামা-কাপড় নিজেই কাচতেন।

কেশবজী ঘুমাতেন খুব কম। সব সময় মনে হতো কেশবজীকে যেন তাড়া করছে সঙ্ঘ কাজ। তাই তাঁর ভেতরে চঞ্চলতা ছিল। বাইরে থেকে এলেই কাঠের সিঁড়ি থেকেই শো-ম্-ভু বলে ডাক দিতেন। আমি সংসারী হওয়ার পর ফোন করে আমার মতো অনেক পরিবারের খোঁজ নিতেন। কেশবজী প্রায়ই বলতেন 'সংগঠন একটা কৌশল মাত্র।' বলতেন— লোকসংগ্রহাম্। আসক্তিবর্জিত হয়ে লোকসংগ্রার্থে কর্ম করতে বলতেন। তিনি অনেককেই অনেক রকম ভাবে উপকার করেছেন, কিন্তু কোনোদিনই তার কাছ থেকে কিছু আশা করেননি।

কার্যালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার পর আমাকে বলতেন— খাবারের ঘণ্টা পড়লে সেই সময় যে কেউ থাকলে ডাকবে। শুধু স্বয়ংসেবকই নয়, অতিথি হলেও খাবার জন্য আগ্রহ করবে। আমি কেশবজীর ওই কথা অক্ষরে অক্ষরে

পালন করেছি। কেশবজী বলতেন সব মানুষের ভেতর দেবত্ব লুকিয়ে আছে, তাকে জাগ্রত করতে পারলে সেও সঙ্ঘের বড়ো কার্যকর্তা হতে পারে। কাজে লাগাবার ঠিকমতো কৌশল জানতে হবে। ধনী-নির্ধন সবার সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। শারীরিক ও মানসিক ভাবে যে স্বয়ংসেবক দুর্বল, কেশবজী তাকে প্রেরণা দিয়ে উৎসাহিত করে সঙ্ঘ কাজের উপযুক্ত করে তুলতেন। সাধক কীরকম হয় তা কেশবজীকে দেখলে মনে হতো। ২৪ ঘণ্টাই তাঁর চিন্তনে মননে শুধু সঙ্ঘের কথা থাকত। হিন্দু সংগঠন শক্তিশালী না হলে এই দেশকে বাঁচানো যাবে না, তাই সর্বক্ষণ উপযুক্ত কার্যকর্তা তৈরিতে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন।

কেশবজী যখন বাইরে যেতেন তখন সমস্ত কাজ বুঝিয়ে দিতেন। অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা কে কবে আসছেন, তার যাতায়াত ব্যবস্থা, থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদি। তখন বেশ কয়েকজনের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হতো। নির্দিষ্ট দিনে কেশবজী ফেরত আসার কথা বললেও অনেক আগেই চলে আসতেন। আমরা কেশবজীকে খুব ভয় করতাম। কার্যালয়ে মাত্র দশজনের খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কেশবজী ও অমলদা খেতে খেতে মারাঠি ভাষায় হাসি মজা করতেন। আমরা বুঝতে পারতাম না।

কোনো কোনোদিন কেশবজী দুপুরে খাওয়ার পরই বলতেন শম্ভু জামা কাপড় পরো। কোথায় যেতে হবে কিছুই বলতেন না। কখনও কোনো কার্যালয়, কখনও কোনো স্বয়ংসেবকদের বাড়ি নিয়ে যেতেন। আসলে কেশবজী যেতেন কে কীরকমভাবে আছে তাই দেখতে। একেই বলে প্রত্যক্ষ দর্শন। তিনি প্রচণ্ড শারীরিক পরিশ্রম করতে পারতেন। প্রতি বছর দু'-তিনবার করে লরিতে ৮৭নং রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট গোডাউন থেকে শিবিরের জন্য মাল পাঠাতে হতো। রোহিণীদা, নারায়ণদা, বিশ্বনাথদা, অশোক নন্দী আমরা ওই জিনিসপত্র উঠানো নামানো করতাম। তখন পয়সা ছিল না। কেশবজী কোনো ব্যবসায়ী স্বয়ংসেবকের ফ্রিতে, না হলে তেলের দাম দিয়ে লরি আনাতেন রাত্রিতে। আমরা তুলতে যেতাম বড়ো ড্রাম, বড়ো বড়ো কড়াই, বালতি, বাঁশ ইত্যাদি। নিজেরা তুলতাম, সঙ্গে কেশবজীও তুলতেন।

১৯৯২ সালে প্রদেশের প্রথম বড়ো শিবির হয়েছিল গয়েশপুরের গোশালায়। সহ-নির্মাণ প্রমুখ হিসেবে প্রায় দেড়মাস আগে গিয়েছিলাম। বিভাগ প্রচারক রাঙাদা এবং নির্মাণ প্রমুখ গজাননদা ছিলেন একটা ছোটো ঘরে। সেখানে বিষধর সাপ ছিল। মাঠের জঙ্গল ও উঁচু নীচু সমান করে শিবিরের উপযুক্ত করা হয়েছিল। কেশবজী ও গণেশদা দেখতে যেতেন প্রায়ই। প্রায় ১৯ হাজার স্বয়ংসেবক ওই শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমাদের সঙ্গে ছিল দেবু ঘোষ, ওখান থেকে সে প্রচারক বেরিয়েছিল। কেশবজী আমাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেছেন ওই জঙ্গলের মধ্যে বসে। পায়খানা তৈরিতে বিভিন্ন জেলার স্বয়ংসেবকদের কায়িক পরিশ্রমের কথা ভুলবার নয়। শিবির শেষে প্রায় তিনদিন পর আমরা সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে ২৬নং-এ ফিরেছি। কেশবজী শেষ পর্যন্ত ছিলেন।

৭৬-৭৭ সালে সারা রাজ্যে ৩২ জন প্রচারক ছিলেন। ২৬নং-এ পুরো রাজ্যের বৈঠক হতো। পরে প্রচারক ও কার্যকর্তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্র বৈঠকের ব্যবস্থা হয়। প্রচারক ও কার্যকর্তাদের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য বৌদ্ধিক ও শারীরিক নিয়ে কেশবজী সব সময় ভাবতেন। নিজে গান শেখাতেন। বলতেন গানের মধ্যে দিয়ে দেশপ্রেম জাগানো যায়। একটা গান যতক্ষণ ঠিকভাবে না হচ্ছে ততক্ষণ অভ্যাস করাতেন।

কেশবজী প্রান্ত প্রচারক। অমলদা প্রান্ত সঙ্ঘচালক। কালীদা প্রান্ত কার্যবাহ। এই জুটিতে তখন সঙ্ঘের স্বর্ণযুগ। তিনজনের মনের মিল এত নিখুঁত ছিল যেন এক মত, এক পথ, এক সিদ্ধান্ত। একটাই লক্ষ্য সঙ্ঘের কাজকে চরম শিখরে নিয়ে যাওয়া। ২৬নং-এর ছাদে অনেকবার বৈঠক হয়েছে। বারান্দায় কলকাতা মহানগর শারীরিক প্রমুখ প্রতাপদা (ব্যানার্জি) শারীরিক নিতেন, তখন কেশবজী দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং তার ভুল শুধরে দিতেন।

কেশবজী খুব ভোরে উঠতেন। অন্যদেরও উঠাতেন। রাত ১১-১২টার সময়

প্রাক্তনদের বাড়িতে কেশবজী।

ঘুমোতেন, আবার সাড়ে তিনটা উঠতেন নিয়মিত। আমারও ওই অভ্যাসটা হয়ে গিয়েছিল। আমি পরে নিয়মিত উঠে সবাইকে ডেকে তুলতাম। এটা কেশবজীকে দেখেই শিখেছি।

সকালে প্রাতঃস্মরণ ও গীতার একটি করে অধ্যায় কেশবজীই পাঠ করাতেন। নিজের জীবনে তিনি গীতার বাণী প্রয়োগ করেছিলেন। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে দেখেছি কেশবজী দুঃখ-কষ্টে ভেঙে পড়তেন না। সুখেও একই রকম থাকতেন। সবার সঙ্গে সমান ব্যবহার করতেন। আমরা অকারণে কারও পক্ষ নিলে তিনি বলতেন সঙ্ঘের প্রচারকদের শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় থাকতে হবে। সঙ্ঘের কাজে সবাইকে দরকার। তাই তো অনেক প্রচারক কেশবজীর জন্য আজীবন সংগঠনের কাজে রয়ে গেছেন।

একবার ২৬নং-এ একজন সন্ন্যাসী কেশবজীর কাছে এসে নমস্কার জানিয়ে দাঁড়ালেন। কেশবজী তখন বলতে শুরু করেন— কী ব্যাপার? এখানে কী? যাও ভগবানকে বন-জঙ্গলে খোঁজ করে নাও। এখানে তো আর ভগবান নেই। সন্ন্যাসী চুপচাপ কেশবজীর কথা শুনছিলেন। খানিক পরে কেশবজী বললেন— এসো এদিকে, বলে নিজের বিছানায় বসালেন। তারপর নানান গল্প। আসলে সন্ন্যাসী পূর্বাশ্রমে যখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএসসি (রসায়ন) পড়ছিলেন, তখন ঘন ঘন কেশবজীর কাছে আসতেন। কেশবজী তাকে প্রচারক হয়ে সঙ্ঘ কাজ করার জন্য বলেছিলেন। সঙ্ঘ কাজেও যে ঈশ্বর লাভ করা যায় বা সঙ্ঘ কাজ যে ঈশ্বরীয় কাজ সেটা বোঝাতে চেয়েছিলেন।

কেউ আমার সমালোচনা করলে মন খুব খারাপ হতো। চুপচাপ থাকতাম। কেশবজী এটা বুঝতে পেরে নিজের উদাহরণ দিতেন, বলতেন, দেখ কান পেতে শোনো— আমার বিরুদ্ধেও অনেকে অনেক কথা বলে। তাই বলে মানুষের মুখ বন্ধ করা যাবে না। মানুষের এটা স্বভাব যে তার থেকে কেউ বড়ো নয়। তাই কে কী বলল মন খারাপ করে লাভ নেই।

কেশবজী ছিলেন সবার প্রতি প্রেমভাবাপন্ন। দয়ালু, নিরহংকার, সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন। ক্ষমাশীল। সদা সন্তুষ্ট। সংযত স্বভাব। মন-বুদ্ধি জীবন সঙ্ঘে অর্পিত। তাই তিনি সবার প্রিয় কেশবজী।

শত অপরাধ করলেও কেশবজী কাছে টেনে নিতেন, সেটা অন্যের হয়তো অপছন্দ হতো। ১৯৭৮ সালে কেশবজীকে হাওড়া ময়দানের কার্যক্রমে দেখেছি মাঠে ঢুকে এক ক্যামেরাম্যানকে প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে। তখন লিলুয়াতে আমি একটা শাখার কার্যবাহ ছিলাম। আর আজকাল কার্যক্রম ছবি ছাড়া হয় না। একটা কার্যক্রমকে সফল করার জন্য যা যা প্রয়োজন তাই করতেন। নিখুঁত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর।

তখন গাড়ি খুব কমজনের কাছে ছিল। কেশবজী কয়েকজনের নাম বলতেন যাদের গাড়িতে সরসঙ্ঘচালকজীকে নিয়ে আসা যায়। যেমন হিন্দ সিনেমার কাছে ভানু পাঞ্জাবি, শ্যামবাজারে অরুণ সাহা, শিবভগবান বাগাড়িয়া, মোতিলাল সোনি এই কয়েকজনের কাছে গাড়ি চাওয়া হতো। ঘনশ্যামজী তো ছিলেনই। কয়েকবার ঘনশ্যামজীর বাড়িতে সরসঙ্ঘচালক দেওরসজীর সঙ্গে আমার ভোজন করার সুযোগ কেশবজীর জন্যই হয়েছিল। কেশব ভবনে বড়ো কেউ এলে বলতেন— শম্ভু এদিকে এসো। বড়ো বড়ো কার্যকর্তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। যেমন একবার এল কে আদবানি এসেছিলেন, কেশবজী ডেকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমার মতো সামান্য কার্যকর্তাকেও তিনি এভাবে সম্মান দিতেন।

১৯৮৪ সালে হিলির মুরারীপুর শাখায় আরএসপি-সিপিএমের আক্রমণে স্বয়ংসেবক প্রশান্ত মণ্ডলের মৃত্যু হয়। তাঁর দাদা বর্তমানে প্রচারক সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল গুরুতর আঘাত পেয়ে বহুদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেই সময় কেশবজী ও গণেশদা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। সুকেশদার জন্য কলকাতায় সমস্ত রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। সুকেশদাকে বাঁচানোর জন্য কেশবজী দিন-রাত চেষ্টা করতেন। সুস্থ হয়ে সুকেশদা পড়াশোনা শেষ করে প্রচারক হন। কেশবজী সমস্ত প্রান্তে চষে বেড়াতেন, স্বয়ংসেবকদের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন।

কেশবজীর হাত দিয়ে এই রাজ্যে বহু সংগঠনের জন্ম হয়েছে। প্রাক্তন প্রচারক তথা জরুরি অবস্থায় ডিআইআর কেসে সত্যাগ্রহী বিমল দাসকে শিশুমন্দির তৈরির জন্য প্রথম আগ্রহ প্রকাশ করেন। আজ শিলিগুড়িতে সরস্বতী শিশুমন্দির পরে বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ নামে খ্যাত হয়েছে। অজিতদা (বিশ্বাস) যেহেতু শিক্ষক, কেশবজীর আগ্রহে তিনি শিক্ষক ও অধ্যাপক সংগঠন তৈরি করেন।

সুভাষ ভট্টাচার্য, তার দাদা বিকাশ ভট্টাচার্য এবং তাঁদের বাবা বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। তাই কেশবজী সুভাষদাকে দিয়ে সংস্কার ভারতীর সংগঠন শুরু করলেন। ডাঃ সুকুমার মণ্ডল ও ডাঃ জয়দেব কুণ্ডুকে দিয়ে ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ, বারাসাতে একজন অধ্যাপককে দিয়ে অধ্যাপক মঞ্চ গঠন করেন। প্রবাল বসুকে দিয়ে গ্রাহক পঞ্চায়েত কাজ শুরু করেন। ডাঃ সুজিতদা ও ডাঃ পুনিত আগরওয়ালকে দিয়ে এনএমও-র কাজ শুরু হয়। জাতীয়তাবাদী অধিবক্তা পরিষদ শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে সর্বক্ষেত্রে কাজ শুরু হয়। সঙ্ঘের কাজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কাজও বাড়তে থাকে। ১৯৮৪ সালে ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি গঠন হলেও ১৯৮৯ সালে পূর্ণ রূপ পায়। আমি বাড়ি ফিরে সংসারী হলেও কেশবজী আমাকে ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির কাজের দায়িত্ব দেন। অমলদা আমাকে স্মারক সমিতির কার্যালয় সম্পাদকের দায়িত্ব দেন। দীর্ঘ ১২ বছর এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম।

১৯৮৩ সালে কেশব ভবনের জমি কেনা হয় এবং ১৯৮৪ সালে ভিত পূজা হয়। সেই ভিত পূজা ও ভিত্তি স্থাপন করেন তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসজী। ভূমিপুজোর দিন উপস্থিত ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী ও অন্যান্য অনেক কার্যকর্তা। ১৯৮৯ সালে বালাসাহেবজীর উপস্থিতিতে দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। কেশব ভবন নির্মাণে যাদের অবদান তাঁদের বালাসাহেবজী পুরস্কৃত করেন। আমিও তাঁর মধ্যে ছিলাম। কেশবজীর সংগঠন কৌশলের কথা বলে শেষ করা যাবে না। তিনি আমার মতো লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবকের মনের মণিকোঠায় বিরাজ করবেন।

প্রণম্য পুরুষ কেশবরাও দীক্ষিত

মহাবীর বাজাজ

কবি দুষ্মন্ত কুমার বলেছেন—

এক বূঢ়া আদমী হ্যায় মুল্ক মে, য়া য়োঁ কহো,

ইস অন্ধেরি কোঠরি মে, এক রোশনদান হ্যায়।

এই দেশে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছেন বা বলা যেতে পারে যে একটি অন্ধকার ঘরের মধ্যে আলোকবর্তিকা আছে।

কেশবরাও দীক্ষিত তাদের মধ্যে একটি বিরল নাম যাঁরা সঙ্ঘের অনেক কার্যকর্তাকে নিজের সঙ্ঘ সাধনার উদাহরণের মাধ্যমে সঙ্ঘ কাজে অনুপ্রাণিত করেছেন। কেশবজী, কেশব ভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসা প্রতিটি স্বয়ংসেবককে নাম ধরে ডাকতেন, তাঁর ও তাঁর পরিবারের সম্পর্কে জানতেন এবং যাওয়ার সময় 'কিছু খেয়ে যাও' বলতেন। আজ হয়তো আমাদের সঙ্গে তিনি সশরীরে নেই, কিন্তু তাঁর খ্যাতি, অনুভূতি আমাদের সঙ্ঘ কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর রাতে নরেশ দারুকার আকস্মিক ফোনে কেশবজীর শরীরের অবনতির সংবাদ পেলাম, কিন্তু আমি তাঁকে ধৈর্য ধরতে বলেছিলাম। কষ্ট পাওয়ার পরিবর্তে সেই কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়াই ভালো। বলা হয় মানুষের ইচ্ছে যাই হোক না কেন, ভগবানের ইচ্ছানুসারেই সব কিছু হয়। অবশেষে ২০ সেপ্টেম্বর সকালে ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে সেই কোমল, বিরল এবং প্রাণময় ব্যক্তিত্বকে ছিনিয়ে নিলেন। একটি অধ্যায়ের যেন সমাপ্তি ঘটে গেল।

কেশবজী ১৯২৫ সালের জানুয়ারিতে মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা জেলার পুলগাঁওতে দত্তাত্রেয় দীক্ষিতের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের প্রত্যক্ষ দর্শন শাখায় ও বাড়িতে বহুবার করেছেন। তাঁর বাবা স্থানীয় সঙ্ঘচালক ছিলেন। তাই ডাঃ হেডগেওয়ার তাঁদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। ডাক্তারজীর অনুপ্রেরণায় কেশবজী অল্প বয়সে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ পূর্ণ করে ফেলেন। বিএ অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, ১৯৪৯ সালে তিনি সঙ্ঘের প্রচারক হন। ১৯৫০ সালের জুন মাসে তাঁকে সঙ্ঘকাজ বিস্তারের জন্য কলকাতায় পাঠানো হয় এবং একনাথ রানাডের নির্দেশ অনুসারে কলকাতার বড়বাজারে বাঙ্গর বিল্ডিঙের ৫১ নং বাড়ি তাঁর কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করেন। তিনি ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত বড়বাজার এলাকায় কাজ করেন এবং অনেক স্বয়ংসেবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন, যারা তার জীবনের শেষ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ছিলেন। পরবর্তীকালে বাঙ্গলার জেলায়-জেলায় ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন এবং বহু দায়িত্ব পালন করেন। কেশবজী তৎকালীন কার্যকর্তাদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন। ৭২ বছরের প্রচারক জীবনে তিনি এমনভাবে এখানকার মাটির সঙ্গে মিশেছিলেন যে সবাই তাকে 'বাঙ্গালি বলেই মনে করতেন। শান্ত, ভদ্র, বিনয়ী কেশবজী সবাইকে আপন করে নিয়েছেন এবং হাজার-হাজার কার্যকর্তাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। যারা আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করছেন।

কিশোর কেশবজী সম্ভবত ডাক্তারজীর কাছ থেকে শুনেছিলেন যে সঙ্ঘের কাজ 'কথার' মাধ্যমে নয়, জীবন্ত সম্পর্কের মাধ্যমে প্রসারিত হবে। ধ্যেয়নিষ্ঠা বা

আদর্শবাদকে কেবলমাত্র প্রচার বা কেবল কথার দ্বারা উজ্জীবিত করা যায় না। শুধুমাত্র যখন এটি একটি আদর্শবাদী জীবনের সংস্পর্শে আসে তখনই তা অন্যের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। 'এক প্রদীপ অন্য প্রদীপ জ্বালায়' এটিই সঙ্ঘের মূলমন্ত্র। এই নীতিবাক্য অনুসরণ করে তিনি আমৃত্যু কাজ করেছেন।

এবিভিপি কার্যকর্তাদের সঙ্গে কেশবজী।

আজ হাজার হাজার কার্যকর্তা মনে করছেন যেন তাদের আত্মার আত্মীয় তাদের মধ্যে থেকে বিদায় নিয়েছেন। এখন কে আমাদের সঙ্ঘের কাজ চালিয়ে যেতে অনুপাণিত করবে? কৌতুক, আলাপ-আলোচনা, সঙ্ঘকাজ এসব উপেক্ষা করে ভগবান আমাদের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়েছেন।

নিমতলা শ্মশান ঘাটে যখন তাঁর মরদেহে ফুল দেওয়ার মুহূর্ত এল, তখন আমার মাথায় এলো যে, এত সহজ-সরল মানুষকে মাত্র ফুল দিয়ে কীভাবে শ্রদ্ধা জানানো যায়—

যার জীবন কাহিনি নতুন আলো দেয়,

সময় যাই হোক না কেন, সর্বদা তাদের প্রণাম করো,

তাঁদের মরদেহে শুধু কি পুষ্প অর্পণ করা যায়?

এমন মানুষ কখনোই মরেও শেষ হয়ে যেতে পারে না।

তাঁর আরেকটি বিশেষত্ব ছিল যে তিনি নিজেকে 'একজন সাধারণ স্বয়ংসেবক' হিসেবে মনে করতেন। সাধারণ স্বয়ংসেবক বলতে বোঝায় নিয়মিত শাখায় যাওয়া, সঙ্ঘের কাজ বিস্তারের জন্য চিন্তা করা এবং সেই অনুযায়ী নিজের জীবন ও আচরণ পরিচালনা করা। আজকাল মনে হয়, অধিকারী হওয়ার পর যেন প্রতিদিন শাখা না যাওয়ার স্বাধীনতা পাওয়া যায়। কাজের সুবিধার জন্য কার্যকর্তাদের বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হয়, কোনো ছাড়ের জন্য নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি আজীবন একজন সাধারণ স্বয়ংসেবকের আদর্শ উপস্থাপন করেছেন। তিনি আমাদের সকলের জন্য অনুকরণীয়।

২০১৫ সালের ডিসেম্বরের একটি ঘটনা। কুমারসভা লাইব্রেরির 'ডাঃ হেডগেওয়ার : ১২৫তম জন্মবার্ষিকী বক্তৃতা শৃঙ্খলা'র সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মঞ্চে থাকার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাতে আমি কেশব ভবনে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। মঞ্চে থাকার কথা শুনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন— না বাবা, সেখানে সব বড়ো বড়ো লোক আসবেন, সেখানে আমার কাজ কী। আমি একজন সাধারণ স্বয়ংসেবক। আমি আবার বললাম যে এটি ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর সমাপ্তি অনুষ্ঠান এবং আপনি ডাঃ হেডগেওয়ারজীকে অনেকবার দেখছেন, সেখানে লোকেরা খুব খুশি হবেন যে আমাদের মধ্যে এমন একজন প্রচারক আছেন যিনি ডাঃ হেডগেওয়ারজীকে দেখেছেন। তিনি তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছিলেন যে— আমি কী ডাঃ হেডগেওয়ার, যাকে মানুষ দেখতে আসবে? তারপর রাজি হয়ে গেলেন।

বলা যায়, খ্যাতি থেকে নিজেকে কতট দূরে রেখেছিলেন এই মহামানব। আজকাল তো এক ফোঁটা জল পেয়ে গেলে মানুষ দেখায় যে সমুদ্র জয় করে নিয়েছে।

কেশবজীকে 'জীবন্ত সম্পর্কের' প্রতিশব্দ বললে অত্যুক্তি হবে না। তিনি প্রতিটা স্বয়ংসেবকের বাড়িতে পৌঁছে যেতেন এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্যের কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। তার স্মৃতিশক্তিও ছিল প্রখর। কয়েক দিন আগে আমার বন্ধু পবন ধেলিয়ার সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে ব্যবসার কারণে যখন তাকে কলকাতা ছেড়ে ত্রিপুরা যেতে হয়েছিল, তখন কেশবজী প্রতি সপ্তাহে তাকে চিঠি লিখতেন, কুশলতা জানতেন এবং একবার তো ত্রিপুরায় দেখতেও চলে এসেছিলেন। কয়েক মাস আগে তার স্ত্রী কোনো কাজে কল্যাণ ভবনে গিয়েছিলেন, তখন তাকে দেখে কেশবজী জিজ্ঞেস করেছিলেন— পবন কেমন আছেন? এমনই ছিলেন কেশবজী।

কেশবজী বলতেন যে সঙ্ঘের কাজকে সঠিকভাবে জানার জন্য যদি কেউ এটির প্রতিষ্ঠার সময়কার পরিস্থিতি এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের ব্যক্তিত্বকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন, তবে এটি স্পষ্ট হবে যে সঙ্ঘ কোনো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শুরু হয়নি। দ্বিতীয়ত, সঙ্ঘের কাজ করার জন্য কাউকে বড়ো ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার বা অন্য কিছু হতে হবে না, শুধু সেবার ইচ্ছা থাকলেই হবে।

সবাইকে একদিন না একদিন মরতে হবে, কিন্তু মানুষ শুধু তাঁকেই মনে রাখে যারা সারাজীবন সমাজ ও রাষ্ট্রের কাজ করেছেন। কেশবজী শুধু রাষ্ট্র দেবতার চরণে তার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেননি, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এবং তার রক্তের প্রতিটি কণা দিয়ে অগণিত কার্যকর্তা তৈরি করেছেন। তাঁর জীবন একটি তপস্যা। কেশবজীকে শত শত প্রণাম। □

আমার স্মৃতিতে কেশবজী

অবনীভূষণ মণ্ডল

কেশবজীর জন্ম ১৯২৫-এ। ১৯৪৭ সালে প্রচারক হন। প্রথম মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলায়। ১৯৫০ সালে পুনে শিক্ষা বর্গে একনাথ রানাডের একটি বৌদ্ধিক ছিল। বিষয় পূর্বাঞ্চল সমস্যা। তাঁর আবেদন ক্রমে মহারাষ্ট্র থেকে ১০ জন প্রচারক বের হন। এই ১০ জনকে পূর্বাঞ্চল কেন্দ্র কলকাতায় পাঠানো হয়। তাঁদের মধ্যে কেশবজীকে কলকাতায় ও মধুকর লিমায়েকে অসমে পাঠানো হয়। কেশবজী মারাঠি ও সংস্কৃত ভাষায় স্নাতক হন। কলকাতায় এসে তিনি বাংলা ভাষা শেখেন। মাতৃভাষা না হলেও তাঁর বাংলায় কথা বলা এতো সুন্দর ছিল যে, বোঝার উপায় ছিল না বাংলা তাঁর মাতৃভাষা নয়। তাঁর ব্যবহার মধুর ছিল। প্রত্যেকটি তরুণ স্বয়ংসেবকের সঙ্গে তিনি খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে যেতেন।

আমি যেমন মনে করতাম কেশবজী আমাকে বেশি ভালোবাসেন, সেই রূপ অন্য কার্যকর্তারাও তেমনই মনে করতেন। তিনি প্রত্যহ যোগাসন, সূর্যনমস্কার ও প্রাণায়াম করতেন। শরীর অত্যন্ত সুগঠিত ছিল। কেশবজীর কণ্ঠে গান শুনলে মন মোহিত হয়ে যেত। শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠ অত্যন্ত সুরেলা ছিল। সংস্কৃত উচ্চারণ অত্যন্ত স্পষ্ট ও ধ্বনি সমৃদ্ধ ছিল। কেশব ভবনে তাঁর নিত্য গীতা পাঠের সুর ও মাত্রা শুনে আমরা অনেকেই তা অনুসরণ করে নিজেদের জেলায় নিয়ে যাই। শঙ্খ (বিউগল) বাজানোতে কেশবজী ছিলেন অদ্বিতীয়। ধ্বজারোপণ, ধ্বজাবতরণ, কালাংশ বদল, জাগরণ, মাঠে স্বস্থান ইত্যাদি বাদ্যের আওয়াজ ছিল শ্রুতিমধুর। তাঁর কাছ থেকেই পরবর্তী সময়ে অনেকেই ভালো শঙ্খবাদক তৈরি হয়েছে। সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে বা শিবিরে থাকার সময় কেশবজীকে দেখেছি সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত, তখন তিনি খোঁজ নিয়ে দেখতেন পরের দিনের জন্য পানীয় জল, স্নানের জলের ব্যবস্থা, রান্নার ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা। তাছাড়া সব কার্যবিভাগের দায়িত্বের কার্যকর্তা ঠিক আছে কিনা। আবার ভোরে জাগরণের শঙ্খনাদও তিনি করতেন।

কেশবজীর বৌদ্ধিক বা প্রবচন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হতো। ডাক্তারজীর বিষয়ে বৌদ্ধিক, শিবাজী মহারাজের বিষয়ে প্রবচন দেওয়ার সময় তিনি অত্যন্ত ভাবুক হয়ে উঠতেন। তাঁর চোখেও যেমন জল আসতো তেমনই স্বয়ংসেবকদের চোখেও জল আসতো। কেশবজী বলতেন— কার্যকর্তা সেই হতে পারেন যিনি নিরন্তর প্রবাস করেন এবং যার ব্যবহার মধুর হয়। বলতেন 'মু' মে সক্কর ঔর প্যার মে চক্কর। তিনি বলতেন, (১) পান পাতা গোছা করে রেখে দিলে পচন ধরে, সেজন্য মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করে আবার গোছাতে হয়।

(২) তাওয়াতে রুটি সেঁকার সময় তা মাঝে মাঝে ঘোরাতে হয়। না করলে পুড়ে যায়, খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায়।

(৩) ঘোড়াকে যদি এক জায়গায় দাঁড়া করে রাখা হয় তাহলে ঘোড়ার পায়ে বাত ধরে যায়। ঘোড়া আর ছুটতে পারে না। যাদের ঘোড়া আছে তাদের সেই ঘোড়াকে সকাল-বিকেল ছোটাতে হয়। সেরকম কার্যকর্তা যদি ভ্রমণ না করে তাহলে সে অলস হয়ে যায়।

প্রদেশে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শাখা শুরু করার উদ্যোগ কেশবজীই নেন। বিভিন্ন জেলায় সেবিকা কার্যকর্ত্রীদের সঙ্গে স্থানীয় সেবিকাদের যোগাযোগ করে দিতেন।

বাঁকুড়া জেলায় ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির প্রাথমিক কাজ শুরু করার জন্য আমাকে বলেন। আমি কেশবজীর আগমনবার্তা লিখে একটি পত্রক ছাপাই এবং সেদিনই একটি অ্যাডহক কমিটি গঠিত হয়। পুরুলিয়াতে অবশ্য ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীকে নিয়ে যান। তারপর মোতিলাল সোনির নেতৃত্বে কলকাতায় একটি প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমি জেলা থেকে একজন কার্যকর্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় ওই সম্মেলনে যোগ দিই। সেরকম ভাবে ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ গঠনেও কেশবজীর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। বাঁকুড়া থেকে অজিত বারিককে ওই কাজে যুক্ত করেন। কেশবজীর প্রেরণায় অজিত বারিক দীর্ঘসময় ওই কাজে দায়িত্ব নিয়ে কিষাণ সঙ্ঘকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

কেশবজী স্বয়ংসেবকদের জীবনে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও প্রয়াস করতেন। অনেককে বাণীপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজে প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যাপারে সুযোগ করে দিয়েছেন। কোন্ স্বয়ংসেবকের মাধ্যমে কোন্ সংগঠনের কাজ হবে তা তিনি সঠিক নির্বাচন করে সেই সংগঠনের কাজে তাকে যুক্ত করতে পারতেন। সেই সদাহাস্যময়, ফুলঝুরি রসিকতার, সেই সুরেলা কণ্ঠ, সেই মধুর সম্বোধন আর শুনতে পাওয়া যাবে না। তবু কেশবজী লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবকের হৃদয়ে বিরাজমান থাকবেন। □

কেশবদা নয়, কেশবজী হিসেবেই তিনি বাঙ্গলার স্বয়ংসেবকদের মনে স্থান করে নিয়েছেন

শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা

পশ্চিমবঙ্গে কাজ করা যে সমস্ত শ্রদ্ধেয় সঙ্ঘ প্রচারকদের সানিধ্য পাওয়ার সৌভাগ্য আমি অর্জন করতে পেরেছি সে তালিকায় শ্রীগুরুজী ও একনাথজীর পরে ক্রমান্বয়ে বসন্তদা, অমলদা, বংশীদা, মাধবদা, দেবুদা, গজাননদা, সঞ্জয়দা, অনন্তদা, শ্যামমোহনদা, রথীনদা, ধর্মদা, সত্যদা, রাঙ্গাদা, মনমোহনদা, রামপ্রসাদদা, বিদ্যুৎদা, শ্রীকৃষ্ণদা, রাধাগোবিন্দদা, গৌরাঙ্গদা, কেষ্টদা, নারায়ণদা, গণেশদা, হরিহরদা, কালীশঙ্করদা, তরুণদা, রামদা, রতনদা, রোহিণীদা, লক্ষ্মীদা, তপনদা, শ্যামলালদা প্রভৃতিদের ভিতরে একমাত্র ব্যতিক্রমী নাম কেশবজী।

প্রচারক লক্ষ্মীদা কেশবজীকে পুস্তক প্রদান করছেন।

বাঙ্গলার তো বটেই, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা সমস্ত প্রচারক 'দা' সম্বোধনে সম্বোধিত হয়ে থাকেন, তবে মহারাষ্ট্র থেকে আসা একমাত্র শ্রী কেশবরাও দত্তাত্রেয় দীক্ষিত 'কেশবদা' বলে সম্বোধন না পেয়ে আজীবন 'কেশবজী' নামেই পরিচিত ও সম্বোধিত হয়ে থাকলেন কেন? এই প্রশ্ন আমার মনকে বার বার নাড়া দিয়েছে। সমাধান খুঁজে পাওয়ার চেষ্টাও করেছি। জানতে পেরেছি যে কেশবজী নাকি প্রচারক হিসেবে প্রথম দায়িত্ব পেয়েছিলেন কলকাতার বড়োবাজার অঞ্চলে অর্থাৎ হিন্দিভাষী ক্ষেত্রের। তাই তাঁকে 'কেশবজী' এই সম্বোধনে ডাকাই স্বাভাবিক ছিল। ৭২ বছরের প্রচারক জীবনের ২-৩ বছরের কার্যকাল বাদ দিলে শেষ ৭০ বছর তিনি সারা পশ্চিমবঙ্গ চষে বেড়িয়েছেন। হাজার হাজার বাড়িতে গিয়ে বাঙ্গালি খাবার খেয়েছেন, বাঙ্গালি ভাষা, বেশভূষা, চালচলন সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করেছেন তথাপি সম্বোধনের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এর বিপরীতে অনন্তলাল সোনী, বংশীলাল সোনী, ধর্মচান্দ নাহর এদের কর্মক্ষেত্র বড়োবাজার অঞ্চল থাকা সত্ত্বেও তাঁরা 'জী' সম্বোধন পাননি। কেশবজীর 'জী' হয়ে থাকা আর অন্য সমস্ত প্রচারকদের স্বাভাবিক ভাবে 'দা' হয়ে যাওয়ার কিছুটা রহস্য আমি কেশবজীর জীবনের শেষ কয়েকটি বছরের কার্যকলাপে এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসা বিভিন্ন ধরনের লোকের কথাবার্তার মাধ্যমে জানতে পেরেছি।

সঙ্ঘকার্য বিস্তার করার জন্য যে সমস্ত গুণ ও কৌশল এক-একজন কার্যকর্তার ভিতরে থাকা প্রয়োজন, কেশবজীর ভিতরে সেই সমস্ত গুণ ও কৌশল বিদ্যমান ছিল। শারীরিক, বৌদ্ধিক, ঘোষ বিভাগ ছাড়া গান ও প্রার্থনার নিখুঁত স্বর ও উচ্চারণে তাঁর আগ্রহ তথা করিয়ে নেওয়ার কৌশল সকলের জন্য অনুকরণীয় ছিল। নব্বই বছর পার হওয়ার পর বয়সের তাগিদে কেশবজীকে কেশব ভবনে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হলো। শারীরিক ভাবে আবদ্ধ হলেও তাঁর মন কিন্তু যাযাবর হয়ে সারা বাঙ্গলায় ঘুরে বেড়াতো। তিনি সুনীলদা, অদ্বৈতদা এমনকী আমাকেও তাঁর মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে দাও, সারা প্রদেশ ঘুরে কার্যকর্তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে চাই। প্রতিদিন বিভিন্ন স্থানের স্বয়ংসেবকদের কেশবজীর সঙ্গে দেখা করতে আসাটা অব্যাহত ছিল। দেখা করতে আসা লোকের ভিতরে নিজ-নিজ স্থানে কেউ সক্রিয়, কেউ নিষ্ক্রিয়, কেউ সন্তুষ্ট, কেউ-বা অসন্তুষ্ট কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক। এছাড়াও কেউ আসে মা-বাবার আগ্রহে, কেউ ছেলে-নাতির আগ্রহে, কারও আসা হয় বউ, বউদি বা বউমাদের আগ্রহে, তো কারও মেয়ে, জামাই বা নাতি-নাতনিদের আগ্রহে। কারও মুখে দাদা, কাকু, জেঠু, দাদু ইত্যাদি সম্বোধন সহজে আসতো না, সবার মুখে একই সম্বোধন 'কেশবজী'। সবাই নিজের মনের কথা তো বটেই মনের ব্যথাও তাঁর সামনে রাখতো আর উনি হাসিঠাট্টার মাঝে সহজ ভাবে তাদের সন্তুষ্ট করে হাসি মুখে বিদায় দিতেন। কেশব ভবনে বসবাসকারী প্রচারক ও ব্যবস্থা বিভাগের কর্মীদের যতই কাজের চাপ থাকুক না কেন, কেশবজীর কাছে গেলে তারা যেন আলাদা শক্তি পেয়ে যেত, এটা আমি অনুভব করেছি। প্রবাসকালে ২-৩ মাসের ফাঁকে আমিও সেই শক্তি পাওয়ার সুযোগ নিতাম। তিনি সবার জন্যই ছিলেন আপনজন।

'অতি পরিচয়াৎ অবজ্ঞা' এই নিয়ম সাধারণ ভাবে সবার ক্ষেত্রে হয়তো খাটতে পারে কিন্তু কেশবজীর ক্ষেত্রে খাটতো না। এর কারণ হলো Respectable distance অর্থাৎ সম্মানিত দূরত্বের পরিবর্তে কেশবজীর আচরণের বিশেষত্ব ছিল সম্মানিত নিকটত্ব অর্থাৎ Respectable closeness or nearness। শেষ জীবনে তিনি অচেতন অবস্থায় প্রায় এক মাস কাটালেন। তার আগে পর্যন্ত তিনি ১০০ বছর বাঁচবেন এই কামনা সবাই করেছিলেন কিন্তু অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকা দেহকে বাইরের প্রাণবায়ু দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা কষ্টদায়ক তাই ঈশ্বরের ইচ্ছাতে তিনি ২০ সেপ্টেম্বর ঈশ্বরের কাছে চলে গেলেন। শতাব্দী পূর্ণ করার দু' বছর আগেই চলে যেতে হলো। নিকট আত্মীয়ের বিরহ বেদনা বাঙ্গলার প্রতিটি স্বয়ংসেবক অনুভব করেছে। কেশবজীর প্রতি বাঙ্গলার স্বয়ংসেবকরা বয়স, ভাষা, পেশা নির্বিশেষে যে শ্রদ্ধা হৃদয়ে ধারণ করেছে তা অতুলনীয়। সুভাষচন্দ্র বসু যেমন শুধু বঙ্গবাসীদের কাছেই নয়, সারা ভারতবাসীর কাছে সুভাষদা না হয়ে 'নেতাজী' নামেই পরিচিত ও সম্মানিত হলেন, ঠিক সেই ভাবে কেশবরাও দীক্ষিত মহারাষ্ট্র থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসে ৭২ বছরের প্রচারক জীবনে হাজার-হাজার পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের কাছে কেশবদা নয় 'কেশবজী' নামে পরিচিত ও সম্মানিত হয়ে চলে গেলেন। নেতাজীর মতো কেশবজীও অমরত্ব লাভ করেছেন। □

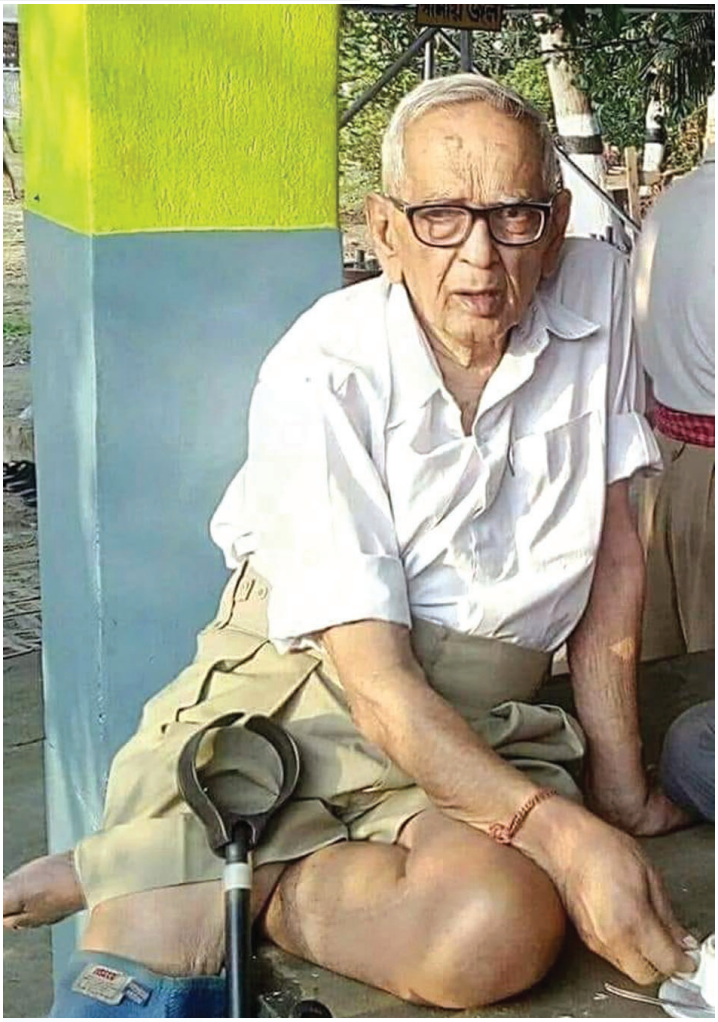

বাঙ্গলায় সঙ্ঘ কাজের সূত্রধর কেশবজী

বিজয় কুলকার্ণী

যে কোনো বড়ো চিন্তা সংক্ষেপে সূত্রাকারে বলার প্রচলন প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে, যেমন মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্র বা দেবর্ষি নারদের ভক্তিসূত্র। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজকে বুঝাবার জন্য মহারাষ্ট্রের প্রান্ত সঙ্ঘচালক বাবা ভিড়েজী একটি সূত্র দিয়ে গেয়েছেন। সেটি হলো 'সঙ্ঘ মানে শাখা, শাখা মানে কার্যক্রম'। বাঙ্গলায় সদ্য প্রয়াত কেশব দত্তাত্রেয় দীক্ষিত অর্থাৎ কেশবজী এই সূত্রটি সারাটি জীবন আচরণ করে একটি দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। ১৯৫০ সালে সঙ্ঘ প্রচারক হয়ে বাঙ্গলায় এসে এই সূত্র ধরেই টানা ৭২ বছর সাধনা করে গেলেন। এই সূত্রই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ছিল। এমনকী তিনি এ নিয়ে গান লিখে ফেললেন— 'সঙ্ঘ মানে শাখা, শাখা মানে কার্যক্রম। নিত্যমাঠে এসে মোরা করব হিন্দু সংগঠন। করব মোরা দেশ গঠন।' এই সূত্র ধরেই সঙ্ঘের কাজ চলছে এবং বেড়ে চলেছে। এই সূত্রের স্মরণ ও

ফ ও ৫

আচরণ কেশবজীর আত্মাকে পরিতৃপ্ত করবে। তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সঙ্ঘ প্রার্থনা ও কেশবজী

কেশবজী বাল্যকালেই প্রার্থনা কণ্ঠস্থ করেছিলেন। এই প্রার্থনা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গেয়েছেন। মোট ৮৫ বছর নিত্য প্রার্থনা করার তিনি একজন কীর্তিমান! এক বিরল সাধনা। এ নিয়ে কেশবজীকে 'প্রার্থনা সিদ্ধপুরুষ' বলা যেতে পারে। সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে কেশবজীর প্রার্থনা বিষয়ক বৌদ্ধিক স্মরণীয় হয়ে আছে।

সুধীদার বাড়িতে কেশবজী

সুধীরঞ্জন গিরি ছিলেন মেদিনীপুর জেলার প্রথম সারির স্বয়ংসেবক। পরে বিভাগ কার্যবাহ হন। তাঁর বাড়ি কাঁথি মহকুমার হেঁড়িয়া থেকে ৪ কিলোমিটার হাঁটা পথে একটি গ্রামে। আমি জেলা প্রচারক হিসেবে কেশবজীর সঙ্গে সুধীদার বাড়িতে পৌঁছুলাম। বাড়িতে বৃদ্ধ পিতা ও অন্যান্য লোক ছিলেন। কেশবজী সুধীদার বাবার চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। পুকুরে স্নান করে খাওয়াদাওয়া হলো। নিতান্ত গ্রামীণ পরিবেশ। কেশবজী ও সুধীদার হৃদ্যতাপূর্ণ কথাবার্তা শুনে আমি অভিভূত হয়েছিলাম।

গুয়াহাটীতে কেশবজী

অজিত জানা মেদিনীপুর জেলার স্বয়ংসেবক। অনেক বছর ধরে ব্যবসার সূত্রে গুয়াহাটি বসবাস। সঙ্ঘ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা। তার আগ্রহে আমি গুয়াহাটিতে যাওয়ার জন্য কলকাতা বিমান বন্দরে এসেছি। বোর্ডিং পাস করে ভিতরে গিয়ে দেখে আশ্চর্য হলাম। দুজন বৃদ্ধ হুইল চেয়ারে বসে আছেন। একজন কেশবজী ও দ্বিতীয়জন গজাননদা। অজিতের একান্ত আগ্রহে দুজনেই গুয়াহাটি যাবেন। উপলক্ষ্য অজিতের বিবাহের রজতজয়ন্তী। আমিও একই উদ্দেশে সহযাত্রী। গুয়াহাটী পৌঁছে একটি হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা। অজিতের গ্রামের অনেক আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এসেছেন। পরের দিন ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে অজিতের নবনির্মিত বাড়িতে ২৫ বছর আগেকার বিবাহ উৎসবের স্মৃতিচারণ। একটি আনন্দমুখর পরিবেশ। কেশবজী ও গজাননদা বসে অনুষ্ঠান দেখছেন। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রীতিভোজ। এক স্বয়ংসেবকের উৎকর্ষ দেখে আমরা সবাই গর্বিত ও আনন্দিত। আমি তাকে একটি অভিনন্দন-পত্র দিয়েছিলাম।

খড়্গপুরে কেশবজী

সুতনু সাঁতরার ছেলের বিবাহের প্রীতিভোজ খড়্গপুরে। আমি কেশিয়াড়িতে ছিলাম। নিমন্ত্রণ পেয়ে খড়্গপুরে এলাম। সেখানে কেশবজী এসেছেন দেখে সুতনুর পরিবারে খুব উৎসাহ। কলকাতা থেকে বিবাহ ভোজে খড়্গপুরে আসা সহজ নয়। কিন্তু কেশবজীকে স্বয়ংসেবকরা এমন স্নেহডোরে বেঁধে রেখেছিলেন যে তিনি বয়স ও দূরত্বকে মানতেন না। বলা যায় ভক্তের বশে ভগবান।

স্বামীজীর সার্ধশতাব্দী যুব-শিবিরে কেশবজী

২০১৩-র জানুয়ারি মাসে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মসার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে কল্যাণী-গয়েশপুরে দক্ষিণবঙ্গের স্বয়ংসেবকদের একটি 'যুবশিবির' অনুষ্ঠিত হয়। দশ হাজারের বেশি যুবক শিবিরে যোগদান করেন। প্রায় ৯০ বছরের যুবা মনের কেশবজী শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। বিশাল মঞ্চ, অভূতপূর্ব প্রদর্শনী, চারিদিকে শিবিরার্থীদের বাস, মাঝখানে প্রাঙ্গণ। উৎসাহ-উদ্দীপনাময় পরিবেশ। কেশবজী গণবেশ পরে স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে ভাববিনিময় করেছেন। সন্ধ্যায় তিনি মঞ্চে উপস্থিত। কেশবজীর বক্তব্য শোনা যাবে বলে সবাই উদ্‌গ্রীব! কেশবজী দাঁড়িয়ে ভাষণ আরম্ভ করলেন— ''১৯৫০ থেকে বাঙ্গলায় সঙ্ঘকাজের অখণ্ড সাক্ষী এই কেশবজী।

বাঙ্গলার বিভাজন পূর্বপরিস্থিতি, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, দেশ বিভাজন ও উদ্বাস্তু সদস্যা, গান্ধী হত্যা ও সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা, সত্যাগ্রহ ইত্যাদি দীর্ঘ কণ্টকাকীর্ণ পথে সঙ্ঘের যাত্রা চলেছে। সব বাধাবিঘ্ন পার করে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা বাঙ্গলায় সঙ্ঘকে আজকের অবস্থাতে নিয়ে এসেছেন। এই যুব-শিবির তাঁর প্রতীক। স্বামী বিবেকানন্দ ও পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর প্রেরণায় সঙ্ঘ আরও উন্নত হবে এই আমার বিশ্বাস। ডাক্তার হেডগেওয়ারের এই গাড়ি চলছে, চলবে। সঙ্ঘ আরও এগিয়ে আরও এগিয়ে যাবে।''

হাওড়ায় কেশবজী

কেশবজীর কেন্দ্র কলকাতা হলেও গঙ্গার ওপারে হাওড়ার সঙ্গে তাঁর অটুট সম্পর্ক ছিল। ১৯৭১ সালে হাওড়া গার্লস্ কলেজের অধ্যক্ষ কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, মাস্টারমশাই নামে খ্যাত, বাঙ্গলার প্রথম প্রান্ত সঙ্ঘচালক নির্বাচিত হন। শ্রীগুরুজী এই ঘোষণা করেছিলেন। তার পরের দিন হাওড়ার কার্যকর্তারা মাস্টারমশাইকে অভিনন্দন জানাবার জন্য হাওড়ায় ভোলাদার বাড়িতে বৈঠকে মিলিত হলেন। সেই বৈঠকে প্রান্ত প্রচারক বসন্তরাও ভট্ট, মাধবরাও বনহাট্টী ও কেশবজী উপস্থিত ছিলেন। সেই দিনেই আমার হাওড়া নগর প্রচারক হিসেবে নিযুক্তি হয়। আমার পরিচয় করানো হলো। আমার পাশে বসা কেশবজী আমার দুটো হাত ধরে নমস্কারের মুদ্রায় করে দিয়ে বললেন। আমার শিক্ষা হলো যে বিদ্যা বিনয়েন শোভতে— পরিচয় করানোর পর নমস্কার করতে হয়।

হাওড়ায় কেশবজী জীবনের শেষপর্যন্ত প্রায়ই আসতেন। অমলেন্দুদা, বুদ্ধদা, শ্রীরামজী-সহ অনেকে কেশবজীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। মাস্টারমশাইয়ের পরিবারের সবার তিনি আপনজন ছিলেন। বিশেষত অরুণদা ও ঋতা (খুকু)-কে স্নেহ করতেন। অরুণদা সংগীতজ্ঞ ও কবি ছিলেন। কেশবজী অরুণদাদের বাড়িতে এসে গানের ক্যাসেট বানাতেন। এভাবে বহু ক্যাসেট তৈরি হলো। তাতে মাস্টারমশাইয়ের রচিত গীত 'তোমার কাজে জীবন দিব', ভবেন্দুদার 'দেশটা ভেঙেছে' ও অরুণদার 'রাষ্ট্রই দেবতা আর অন্যকিছু নয়' ইত্যাদি স্মরণীয়।

কেশবজী শিশুমন্দিরের কাজে উৎসাহ দিতেন। তিনি বিদ্যা ভারতীর আগ্রহে আমাকে বাঙ্গলার সংগঠন মন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমি এখনও সেই দায়িত্ব পালন করে চলেছি। কেশবজী বাঙ্গলায় বিভিন্ন জায়গাতে শিশুমন্দিরের অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। হাওড়াতে মনে হয় কেশবজী নগর সঙ্ঘচালক ডাঃ সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় শেষবার এসেছিলেন। আমিও সেই সভায় ছিলাম। কেশবজী ও গজাননদা দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চে উঠেননি বা কিছু বলেননি। মৌন ভাববিনিময়।

'হরি অনন্ত, হরিকথা অনন্ত'-এর মতো কেশবজী সারা বাঙ্গলার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার সঙ্গে পরিচয় ও আন্তরিক সম্পর্কের কথা ভুলবার নয়। তিনি যেখানেই থাকুন আমাদের রাষ্ট্রকার্যে প্রেরণা দিতে থাকুন— এই প্রার্থনা।

কেশবজী চিরকাল স্বয়ংসেবকদের হৃদয়ে চিরবিরাজমান থাকবেন

মন্দার গোস্বামী

চলে গেলেন কেশবরাও দীক্ষত। কেশবজী নামেই তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর স্নেহধন্য প্রত্যক্ষ স্বয়ংসেবকদের মধ্যে তিনিই সম্ভবত বাঙ্গলার শেষ স্বয়ংসেবক। গত ২০ সেপ্টেম্বর সকলকে শোকার্ত করে ৯৮ বছর বয়সি সঙ্ঘ প্রচারক বিলীন হয়ে গেলেন পঞ্চভূতে। আর এর সঙ্গেই পরিসমাপ্তি ঘটল বঙ্গে সঙ্ঘের ৭২ বছরের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের। কেশবজীকে প্রথম দেখি, যেদিন আমি সর্বপ্রথম শাখায় আসি। তখন আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। খুব স্পষ্ট মনে নেই, তবে সময়টা ছিল ইন্দিরা গান্ধী হত্যার দু'এক মাস পর কোনও এক রবিবার। বাড়ির পাশের মাঠেই সেদিন প্রথম শাখার সূচনা হচ্ছে। একদল লোক কোদাল হাতে সম্পত রেখা, মণ্ডল, ধ্বজস্থান, কবাডি কোর্ট নির্মাণে ব্যস্ত। কেশবজীর ধবধবে পরিষ্কার রাজকীয় চেহারাটা প্রথম দিনই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনিও কোদাল হাতে সম্পত রেখা, মণ্ডল, ধ্বজস্থান, কবাডি কোর্ট নির্মাণে ব্যস্ত। এলাকায় মহিলাদের একটি শাখা (রাষ্ট্রীয় সেবিকা সমিতি) আগে থেকেই ছিল। সেখানে আমাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ছেলেদের শাখা শুরু হওয়ায় সে দুঃখ ঘুচল।

শাখা শুরুর প্রথম দিন থেকেই শাখায় আসতে শুরু করলাম। সেই রামকৃষ্ণ শাখা আগের জায়গা থেকে সামান্য দূরে আজও টিকে আছে। শাখাটি সেই সময় বহরমপুর নগরের যথেষ্ট প্রভাবী শাখা ছিল। অনেক বিশেষ কার্যক্রম সেই শাখায় হয়েছে। জেলা, নগর অথবা শাখার বিশেষ কার্যক্রমে কেশবজী মাঝে মধ্যেই বহরমপুরে আসতেন। তখন কেশবজীর সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ হতো। কয়েকবার আমাদের বাড়িতেও

স্বস্তিকার কয়েকজন লেখকের সঙ্গে কেশবজী।

এসেছেন। আপাতদৃষ্টিতে ভাবগম্ভীর মনে হলেও ভেতরে বেশ রসিক মনের ছিলেন। একবার শাখায় নগরের বার্ষিক বনভোজন চলছে। খাওয়ার পর প্রায় অনেকেরই ঘুম ঘুম ভাব, কেউ কেউ বাড়ি পালাবার তালে। এই সময় কেশবজীর বৌদ্ধিক শুরু হলো। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পারিবারিক মূল্যবোধের বিষয়ে, তুলনামূলক কিছু ঘটনা এমনভাবে রসিয়ে রসিয়ে বললেন যে সকলেই হেসে কুটোপাটি। ঘুম টুম সব হাওয়া, মন্ত্র মুগ্ধের মতো সকলে তখন কেশবজীর বক্তব্য শুনছে। শুনেছি একবার নাকি কোনো বৈঠকে কারা কারা জীবনে প্রেম করেছে তাই জানতে চেয়েছিলেন। উত্তর না পেয়ে মজা করে বলেছিলেন 'প্রেমই পারলে না, তো কীভাবে সমাজের সঙ্গে মিশে সংগঠন করবে?' অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তা ছিলেন কেশবজী।

অভিনেতা ভিক্টর ব্যানার্জি একবার সঙ্ঘের কোনও এক কার্যক্রমে এসেছেন। তিনি খুবই সিগারেট খেতেন। এসেই সিগারেট ধরিয়েছেন। তিনি তখন একজন প্রথিতযশা অভিনেতা। কারোরই সাহস হচ্ছে না নিষেধ করার, কেশবজী সটান তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে কেন সেখানে সিগারেট খাওয়া উচিত নয় তা বুঝিয়ে বললেন। ভিক্টর ব্যানার্জিও ব্যাপারটি বুঝতে পেরে সিগারেট খাওয়া থেকে বিরত থাকলেন। ১৯৯৫-এ মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ একই সঙ্গে হয়েছিল। সেই শিবিরে কেশবজী শিক্ষার্থীদের প্রার্থনা শেখাতেন। উচ্চারণ, স্বর প্রক্ষেপণ, সুর সকলকে যত্ন করে শিখিয়ে দিতেন। আমারও এই শিবিরে কেশবজীর কাছ থেকে প্রার্থনা শিখবার সুযোগ হয়েছিল।

কেশবজীকে বঙ্গ প্রতিনিধি বলা হয় বটে, বাস্তবে তিনি ছিলেন মারাঠি। মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা জেলার পুলগাঁওয়ে ১৯২৫ সালের ১ আগস্ট তাঁর জন্ম। এ এক অদ্ভুত সমাপতন। এক কেশবের জন্ম ১৯২৫-এর আগস্টে, আর মাত্র দু' মাস পরই আর এক কেশব (সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার) পরম বৈভবশালী ভারতবর্ষ নির্মাণের স্বপ্ন নিয়ে বিজয়া দশমী তিথিতে স্থাপন করবেন সঙ্ঘের, যা পরবর্তীকালে বিশ্বের বৃহত্তম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সঙ্ঘের নামে বিশ্ব প্রসিদ্ধি লাভ করবে। পাঁচ ভাই, চার বোনের মধ্যে কেশবজী ছিলেন দ্বিতীয়। পিতা দত্রাত্রেয় দীক্ষিত তাঁর বাবার সঙ্ঘের সঙ্ঘে সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে খুব ছোটো বয়স থেকেই কেশবজী সঙ্ঘ শাখায় আসতে শুরু করেন।

সুমধুর কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গান, প্রার্থনার পাশাপাশি বৌদ্ধিকেও তাঁর বিশেষ দখল ছিল। এই ভাবেই একটি সঙ্ঘ কার্যক্রমে স্বয়ং সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর নজরে পড়ে যান। এক কেশব চিনতে পারলেন আর এক কেশবকে। কেশবজীর বাবাও সঙ্ঘের একজন গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর্তার দায়িত্বে ছিলেন। তাই মাঝে মধ্যেই ডাক্তারজী কেশবের বাড়িতে আসতেন। এভাবেই ধীরে ধীরে সঙ্গে বালক কেশবের সঙ্গে ডাক্তারজীর বিশেষ সখ্য গড়ে উঠল। ডাক্তারজীর প্রবল ব্যক্তিত্বের কারণে পরাধীন ভারতবর্ষের এক কিশোরের অন্তরে জ্বলে উঠল তীব্র দেশপ্রেমের আগুন। পড়াশোনার পাশাপাশি সঙ্ঘ কাজও জোর কদমে চলতে থাকল। ১৯৩৯, ১৯৪০, ১৯৪১ পর পর সঙ্ঘের প্রথমবর্ষ, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় বর্ষের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করলেন। স্কুল জীবন শেষ করে অবশেষে কলেজ জীবন। সেখানেও বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখলেন। মারাঠি ও সংস্কৃত দুই বিষয়েই তিনি সাম্মানিক-সহ স্নাতক হন। সময়টা ১৯৪৯ সাল পরমবৈভবশালী ভারত নির্মাণের লক্ষ্যে মহারাষ্ট্র থেকে সঙ্ঘের যে সকল স্বয়ংসেবক প্রচারক জীবনের ব্রত নিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, কেশবজী ছিলেন তাদেরই অন্যতম।

প্রচারক অর্থাৎ গৃহের সুখ স্বাচ্ছন্দ সম্পূর্ণ ত্যাগ করে প্রায় সন্ন্যাসীসম জীবন। কেশবজীকে কলকাতায় পাঠানো হলো। দেশ তখন সবে স্বাধীন হয়েছে। দেশবিভাগের দগদগে ঘা নিয়ে বাঙ্গলার সমাজ জীবন তখন বিপর্যস্ত। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে সেই সময় ভীত, সন্ত্রস্ত ছিন্নমূল হিন্দুরা দলে দলে এসে আশ্রয় নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। গান্ধীজী হত্যার মিথ্যা অপবাদে সঙ্ঘের ওপর চলছে সরকারি নিপীড়ন। এমনই এক অস্থির সময়ে কলকাতার বড়বাজারে সঙ্ঘ কাজ শুরু করলেন কেশবজী। ইতিপূর্বে গুরুজী কলকাতায় এসে সঙ্ঘের কিছু কার্য বিস্তার করে গিয়েছিলেন। কেশবজী গুরুজীর প্রদর্শিত পথেই কাজ শুরু করলেন। নতুন নতুন সম্পর্কের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে সঙ্ঘ শাখা শুরু হলো। সম্পূর্ণ অজানা ভাষা, অচেনা পরিবেশের বাঁধন কাটিয়ে সদ্য স্নাতক এক মারাঠি যুবক স্বল্প সময়েই আদ্যপান্ত বাঙ্গালি হয়ে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বললে বোঝাই যেত না, যে তাঁর মাতৃভাষা মারাঠি। বাঙ্গলাকে তিনি সম্পূর্ণ আপন করে নিয়েছিলেন। বাঙ্গলায় সঙ্ঘ কাজে বহু বাধা বিঘ্ন এসেছে। প্রতিবারই কেশবজীর সুদক্ষ নেতৃত্বে সঙ্ঘ সেই বাধা অতিক্রম করেছে।

১৯৬২-তে চীন যুদ্ধ। ৬৫-তে পাক যুদ্ধ, ৭১-এ অধুনা বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ, ৭৫-এ জরুরি অবস্থার কারণে সমাজ জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘেও বিপর্যয় নেমে এসেছে। কিন্তু কেশবজী বাঙ্গলার স্বয়ংসেবকদের নিয়ে সেই অস্থিরতার যোগ্য মোকাবিলা করেছেন। ১৯৭৫-এ সঙ্ঘকে যখন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে রাজ্য পুলিশের কাছে মোস্ট ওয়ান্টেড ছিলেন মাত্র দুই জন--- এক, তৎকালীন সঙ্ঘের এই পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক কালিদাস বসু, দুই, কেশবরাও দীক্ষিত। অনেকে গ্রেপ্তার হলেও, সঙ্ঘের পূর্ব যোজনা মতো 'সুবোধ গুপ্ত' নাম নিয়ে কেশবজী ছদ্মবেশে সঙ্ঘ কাজ দেখাশোনা করতেন। বঙ্গ পুলিশ তাঁর টিকিটিও ছুঁতে পারেনি। বাঙ্গলায় ৭২ বছরের সঙ্ঘ জীবনে কেশবজী বহু সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন কলকাতা মহানগর প্রচারক, পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক, পূর্বক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ, সহ-পূর্বক্ষেত্র প্রচারক... প্রভৃতি। আজ কেশবজীর মতো কার্যকর্তাদের কারণেই বঙ্গে সঙ্ঘ এক দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সুদৃঢ় সাংগঠনিক নেতৃত্বের মাধ্যমে অসংখ্য সুযোগ্য কার্যকর্তা নির্মিত হয়েছে। আজও হয়ে চলেছে। আগামী দিনের সঙ্ঘ কার্যের বিস্তারে তিনি অন্যতম প্রেরণাদায়ী রূপে সকল স্বয়ংসেবকের হৃদয়ে চির বিরাজমান থাকবেন। □

আমার স্মৃতিতে কেশবজী ও শ্যামলালদা

প্রবীর মিত্র

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে— কবির এই আপ্তবাক্যকে স্বীকার করে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এই কথাকে মেনে নিতেই হয়। মানুষের যখন জন্ম হয় তখন শ্বাস থাকে, নাম থাকে না। আবার মৃত্যুর সময় মানুষের শ্বাস থাকে না, নাম থাকে। সেই হিসেবেই কেশবজী ও শ্যামলালদা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কেশবজী ও শ্যামলালদা ঈশ্বর প্রদত্ত আয়ুষ্কালের মধ্যেই জীবিত ছিলেন। কিন্তু 'ম্যান লিভস্ ইন ডিডস্' নট ইন ইয়ার্স এই প্রবাদ বাক্যকে সার্থক করে গেছেন। তাঁদের কর্মময় জীবনের স্মৃতিই আমাদের মধ্যে চির জাগরুক থাকবে।

কবির আর একটি আপ্তবাক্যে বলা হয়েছে— 'চির স্থির কবে নীর, হায়রে জীবন নদে।' নদীর মতো জীবনও চির প্রবহমান। নদী যেমন চলার পথে অসংখ্য উর্বর ভূমি সৃষ্টি করতে করতে যায়, সেইরূপ কেশবজী ও শ্যামলালদা তাঁদের চলার পথে অসংখ্য স্বয়ংসেবক কার্যকর্তাদের সমৃদ্ধ করে গেছেন। সেই অসংখ্য স্বয়ংসেবক কার্যকর্তাদের মধ্যে আমিও একজন। কেশবজী ও শ্যামলালদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ১৯৭৪ সাল থেকে। স্বাভাবিকভাবেই এই দীর্ঘ সময়ের স্মৃতির ঝুলিতে অনেক ঘটনাই আছে। একজন কার্যকর্তা বলছিলেন, কেশবজী সঙ্ঘ কাজে একজন মাস্টার। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে জ্যাক অব অল ট্রেডস্ মাস্টার অব নান সঙ্ঘ কাজে কেশবজী ছিলেন মাস্টার অব অল।

প্রান্ত প্রচারক হয়েও সাধারণ স্বয়ংসেবকদের প্রতি তাঁর স্নেহসুলভ দৃষ্টি ছিল। আমার একবার হার্টের সমস্যা হয়েছিল। কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলাম। ডাক্তার সুজিত ধর বললেন হার্টে ফুটো আছে। তিন দিন বিশ্রাম, অ্যাটাচ বাথরুম আছে এমন ঘরে থাকতে হবে। ফিরে এলাম কেশব ভবনে। কীভাবে ব্যবস্থা হবে বুঝতে পারলাম না। একজন সাধারণ স্বয়ংসেবকের জন্য প্রান্ত প্রচারক এগিয়ে এলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার ধরকে ফোন করে রোগীর অবস্থা বুঝে নিলেন এবং নিজের ঘরে থাকার ব্যবস্থা করলেন। পরের দিন নার্সিংহোমে ভর্তির ব্যবস্থা করলেন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

কেশবজী খুব রসিক ছিলেন। বৌদ্ধিকের অনেক গভীর বিষয় তিনি রসোচ্ছলে উপস্থাপিত করতেন। তাঁর এই রসিক মনে একটা আবেগ ছিল, সংকল্প ছিল। যার ফলস্বরূপ প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তারজীর, গুরুজীর স্মৃতিবিজড়িত কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে শেষ জীবন কাটিয়ে দিলেন। কেশবজী যেহেতু প্রথমে বড়বাজার এলাকার দায়িত্বে ছিলেন থেকে এসেছিলেন সেজন্য তিনি জী থেকে গেলেন। শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সকলের শ্যামলালদা। কলকাতায় আমার ছেলে পড়তো। তখনও থাকার ব্যবস্থা হয়নি। কিছুদিন কেশব ভবনে থাকতে হয়েছিল। আমার ছেলে সোমবার করে শিবের মাথায় জল ঢালতো। এগিয়ে এলেন শ্যামলালদা। তাঁর ঘরে বহু দেবদেবীর অবস্থান। সেখানেই ব্যবস্থা হলো।

কেশবজী ও শ্যামলালদা বাঙ্গলায় সঙ্ঘ কাজের স্তম্ভ ছিলেন। আজ যাঁরা বিভিন্ন কার্যকর্তা গত হয়েছেন, তাঁরা তাদের জীবদ্দশায় কর্তব্য করে গেছেন। বর্তমানে আমরা জীবিত, আমাদের জীবদ্দশায় কর্তব্য করলেই তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো সঠিক হবে।

বাঙ্গলার সঙ্ঘ-ভগীরথ কেশবজী আর নেই

ধীরেন দেবনাথ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নবতিতম প্রচারক কেশবরাও দত্তাত্রেয় দীক্ষিত আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। ২০ সেপ্টেম্বর ৯৮ বছর বয়সে তাঁর ঘটেছে জীবনাবসান। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় তিনি ভুগছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে শতায়ু হতে দেননি। তবে বাঙ্গলার প্রত্যেক স্বয়ংসেবক তাঁকে চিরকাল মনে রাখবেন।

১৯৫০ সালে তিনি বাঙ্গলায় আসেন প্রচারক হিসেবে। এখানেই কাটিয়ে দেন জীবনের ৭২টি বছর। তিনি বাঙ্গলায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। মনেই হতো না, তিনি বাঙ্গালি নন। তাই তিনি বাঙ্গলা ও বাঙ্গালির কাছে ছিলেন অত্যন্ত প্রিয় মানুষ।

কেশবজী ২০১২ সালে গয়েশপুরের বিশাল মাঠে সঙ্ঘের যে মহাসম্মেলন হয়েছিল তখন তিনি কয়েকজন বরিষ্ঠ কার্যকর্তার সঙ্গে আমার বাড়িতে পদধূলি দিয়েছিলেন। তখন আমি নদীয়া জেলা সঙ্ঘচালক। আজও মনে আছে, তিনি শুধুমাত্র এক গ্লাস দুধ পান করেছিলেন। আমাদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন এবং স্পষ্ট বাংলা ভাষায় কথা বলেছিলেন। যতবার কেশব ভবনে গিয়েছি— ততবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে পদধূলি নেওয়ার চেষ্টা করেছি। গত মে মাসে একটা বিশেষ কাজে কেশব ভবনে গিয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে দেখাও করেছি। তখন তিনি বেশ অসুস্থ। প্রতিবারের মতো ফল-মিষ্টি নিয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে চিনতে পারলেন। বেশ কিছুক্ষণ কথাও হলো। কিন্তু ভাবিনি, সেই দেখাই হবে শেষ দেখা!

বাহাত্তর বছর বঙ্গে কেশবজীর বাস না প্রবাস

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

কেশবরাও দত্তাত্রেয় দীক্ষিত (১৯২৫-২০২২) ১৯৫০ সালের ২৫ জুন কলকাতার বড়বাজার এলাকায় উপস্থিত হলেন। পরমপূজ্য গুরুজী তখন সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক। বঙ্গপ্রদেশ সম্পর্কে গুরুজীর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রদ্ধা ছিল। গুরুজীর গুরু ছিলেন বঙ্গ সন্তান তথা শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ। গুরুজীর নির্দেশে কেশবজী কলকাতায় এলেন এবং ভাগ প্রচারক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। কেশবজী ইতোমধ্যে ১৯৩৯ সালে সঙ্ঘের প্রথমবর্ষ, ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বর্ষ এবং ১৯৪১ সালে তৃতীয় বর্ষ শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছেন। ডাক্তারজী থাকতেই তাঁর সঙ্ঘে প্রবেশ ১৯৩১ সালে।

গুরুজীকে কথা দিয়েছিলেন কেশবজী যে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রবাদী শক্তির পূর্ণ প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তিনি এ রাজ্য ছাড়বেন না। কথা রেখেছিলেন তিনি। বঙ্গ ছেড়ে ফিরে যাননি। একাদিক্রমে ৭২ বছর বঙ্গে কাটিয়ে গেলেন। এ কী বঙ্গ-বাস না প্রবাস? চাকরি সূত্রেও নয়, কেবলমাত্র দেশকে ভালোবেসে বঙ্গে প্রবাসে এসে বাঙ্গালি হয়ে যাওয়া!

একদিন জিজ্ঞেস করলাম, বঙ্গে এতদিন অবস্থান কেন? বললেন ডাক্তারজীই তাঁর বঙ্গপ্রীতির মূল অনুপ্রেরণা। ডাক্তারজী নিজেও বহুদিন বঙ্গে অবস্থান করেছেন। তার পরই কেশবজী বললেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল ধারা দুটি— একটি মহারাষ্ট্রীয় ধারা, অপরটি বঙ্গীয় ধারা। মহারাষ্ট্রীয় ধারায় লোকমান্য তিলক গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসবের অন্তর্লীন ভাব-সৌকর্য দিয়ে যখন ভারতীয় যুব সমাজের মধ্যে দেশভক্তির মনন তৈরি করে দিচ্ছেন, তখন বঙ্গধারায় মা ভবানী, মা কালী তথা দেশমাতৃকার ভৌমরূপ 'ভারতমাতা'-র অনুসরণে রচিত হয়ে গেছে বঙ্গ-প্রবাহ। বঙ্গ প্রবাহকে পরিপুষ্টি দিয়েছেন বঙ্কিম, বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ। কেশবজী বললেন, আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা মহারাষ্ট্রীয় ধারায়; আমার জন্মভূমি। আমার কর্মভূমি আর একটি পবিত্র ধারায় আমি রচনা করে নিতে চাইলাম। যে প্রদেশ এত মননশীল সুসন্তানের জন্ম দিয়েছে, তাকেই নিজের কর্মভূমি করতে চাইলাম। স্বাধীনতার অমৃতমহোৎসবে এসে একথা যখন আমি ভাবি, নিজেই অবাক হয়ে যাই, ভারতমাতাকে বারবার প্রণাম জানাই, তোমার অপরূপ রূপমাধুরী আমায় দেখিয়েছো। আমি বঙ্গে এসে প্রকৃতার্থে 'দ্বিজ' হয়েছি। এভূমি কিছুতেই ছাড়ার নয়! আর ছাড়াবোই-বা কেন? সত্যিই 'ভায়ের মায়ের এত স্নেহ' কথাটি যে কবি বলেছেন, তা আদ্যন্ত সত্য। বঙ্গদেশের স্বয়ংসেবকেরা আমাকে সত্য সম্পর্ক দিয়েছে। এত আত্মীয় ছেড়ে আমি কোথায় যাবো? সঙ্ঘকে বললাম, বাঙ্গলা আমার ছাড়া চলে না! আমি এখানেই বঙ্কিম- বিবেকানন্দ-অরবিন্দকে খুঁজে নিতে চাই। বঙ্গদেশ আবারও যেদিন জেগে উঠবে, সেদিন ভারতবর্ষ নামক সূর্যের দিকে তাকানো যে কোনো দেশের পক্ষেই কঠিন হবে।' সেই থেকে কেশবজী রয়ে গেলেন বাঙ্গলায়। 'দেশপ্রেম' নামক গাঙ্গে অবগাহন করালেন বাঙ্গালিকে। আর কখন যে 'মারাঠি' পরিচয় খসে গিয়ে 'বাঙ্গালি' তকমা এঁটে গেল, টেরও পেলেন না! বাঙ্গলাকে ভালোবেসে স্বল্প

সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় কথা বলতে, পড়তে ও লিখতে শিখলেন। রবীন্দ্রনাথকে জানলেন। জানালেন ভারতপ্রেমী অন্য বাঙ্গালির সাহিত্যও। বাঙ্গলার সমস্ত মনীষীদের নিয়ে গর্ব করতে শিখলেন।

২০১৯ সালে কেশবজী ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের বাংলা পত্রিকা 'ভারতীয় কিষাণ বার্তা'র জন্য একটি শুভেচ্ছা বার্তা বিশুদ্ধ বাংলায় লিখে দিলেন। আমি তখন ওই পত্রিকার সম্পাদক। কেশবজী 'স্বস্তিকা' পত্রিকা নিয়মিত পড়তেন। দেখা হলে বলতেন, ওই পত্রিকায় আমার কী কী নিবন্ধ তিনি পড়েছেন। প্রবন্ধ-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ওঁর কাছ থেকে অনেক বিষয়ে মতামত পেয়েছি। সহজ-সরল ভাষায় বাঙ্গালি কৃষকদের জন্য প্রযুক্তি-প্রবন্ধ লিখলে, তিনি খুশি হতেন। নিবেদিতা সম্পর্কে বিশেষ চর্চা করতে বলেছিলেন আমায়। বলেছিলেন, নিজের দেশ ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে, সম্পূর্ণ নতুন একটি আবহাওয়ার দেশে বিনা যত্নে নিজেকে রেখে দেশসেবার যে নিদর্শন রেখে গেছেন নিবেদিতা, সেটা ভারতবাসীর কাছে এক অনন্য প্রেরণা। তিনি বলতেন,সিস্টার নিবেদিতা হিমশৈলের একটি চূড়ামাত্র। খুব অল্পই তাঁকে দেখা যায়; 'না দেখা' অনেক বেশি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিবেদিতা যে কী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তার গবেষণা এখনও হয়নি। বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ চর্চার কথাও তিনি বারে বারে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কী খেতে পছন্দ করেন? বললেন ভালোবেসে তোমরা যা দাও, তাই তো খাই! তোমাদের প্রিয় খাবার আমারও প্রিয়। বাঙ্গলার সব খাবারই আমার প্রিয়। শুক্তো, ছেচকি, ঝাল-ঝোল-অম্বল, মুড়কি, রসগোল্লা, পিঠেপুলি নানান খাবার। তবে মহারাষ্ট্রে থাকতে যে খাবারটি ছোটোবেলায় খুব ভালোবাসতাম, 'পারন পুরি' আর 'শ্রীখণ্ড দই'— সেটা আর পাই না। তোমরা যাকে 'গামছা বাঁধা দই' বলো, সেটাই যেন শ্রীখণ্ড। মিষ্টি দই পাতলা কাপড়ে রেখে দইয়ের জল বার করে দিলে তুলতুলে নরম পেঁজা তুলোর মতো দই হয়ে যায়, তার নাম 'শ্রীখণ্ড'। লুচি-তালের বড়া-মালপোয়া প্রভৃতি বাঙ্গলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রবাসে গিয়ে পাওয়ার পর শ্রীখণ্ড দই আর পারন পুরির কথা ভুলেই গেলাম। বাঙ্গলায় না এলে ভারতবর্ষকে চেনা যাবে না।

আজ যখন 'গর্গল করা বাঙ্গালি' এক বিশেষ পক্ষ অবলম্বন করে বাঙ্গালি-অবাঙ্গালিতে ভাগ করে দিয়েছেন বাঙ্গলাকে; আজ যখন 'গর্গল সম্প্রদায়' অবাঙ্গালির পদবি দিয়েই বিচার করছে তাদের বঙ্গবোধ, তখন আমাদের মধ্যে আমরা কেশবজীর মতো অনেক মানুষ পেয়েছি, যাদের অবাঙ্গালি বললে, বাঙ্গলাকেই প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়াতে হবে! বাঙ্গালি কি আজ অবাঙ্গালিদের মধ্যে আত্মীয়তাবোধ ভুলে যাচ্ছে? বাংলা ভাষায় কথা বললেই যে বাঙ্গালি হয়ে যান না, বাঙ্গলার আবহমানকালের সংস্কৃতিকে নিজের সংস্কৃতি বলে স্বীকার না করলে যে 'বাঙ্গালি' হওয়া যায় না, এই সহজ সত্যটুকু বাঙ্গালি ভুলে গেল কীভাবে!

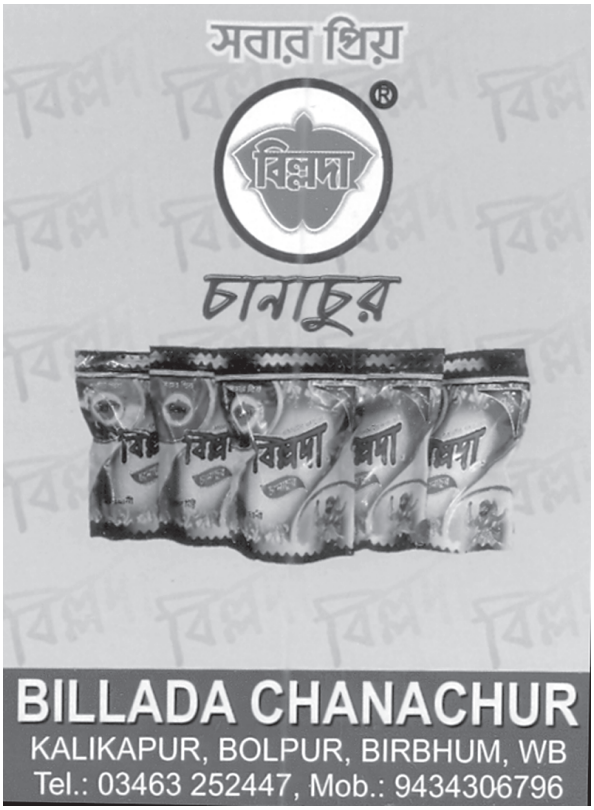

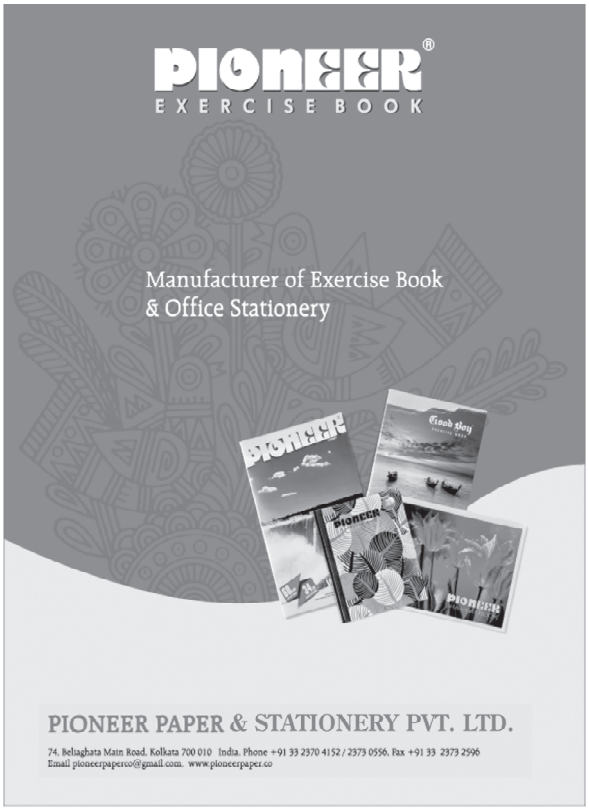

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

শ্যামলালদাকে যেমন দেখেছি

অতুল কুমার বিশ্বাস

১৯৭০ সাল। আমার পূর্ববঙ্গীয় এক আত্মীয় কৃষ্ণনগরে মেসে থেকে পড়াশোনা করতেন। তার অসুস্থতার খবর পেয়ে শক্তিনগর হাসপাতালে গেলাম তাকে দেখতে। তার পাশের বেডে একজন মারা গেছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেই মৃতদেহ সরাতে বিলম্ব করছে। আমার ওই আত্মীয় আমাকে কৃষ্ণনগর মতিসুন্দরী ভবনের ওই মেসে শ্যামলালদার কাছে পাঠালেন যাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই মৃতদেহ তাড়াতাড়ি সরানোর ব্যবস্থা করা যায়। তখন শ্যামলালদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। শ্যামলালদা তখন ছাত্রদের সঙ্গে মেসের একটি বেডে থাকতেন এবং ছাত্রদের সাহায্য নিয়ে জেলার সঙ্ঘ কাজ বাড়ানোর চেষ্টা করতেন। একদিন শ্যামলালদা আমাদের ওই আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে আমার গ্রামে পৌঁছলেন এবং আমাদের ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে বসে তাদের সঙ্ঘের আদর্শ, উদ্দেশ্য বোঝালেন, সেখানে সঙ্ঘের শাখা খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সকলের সম্মতিতে শুরু হয়ে গেল সঙ্ঘের শাখা। টানা তিন মাস বিস্তারক রেখে শাখাটিকে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা হলো। প্রথম দিকে সবাই সক্রিয় থাকলেও ধীরে ধীরে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। আমার মতো কয়েকজন শাখাকে ধরে রাখার ব্যাপারে পরিশ্রম করতে লাগল।

নদীয়া জেলাতে সঙ্ঘের কাজ ১৯৪১-৪২ সালে শুরু হলেও মূলত সেই কাজ ছিল নবদ্বীপ কেন্দ্রিক। শ্যামলালদাকে ১৯৬১-৬২ সালে জেলা প্রচারক হিসেবে জেলাকেন্দ্র কৃষ্ণনগরে রেখে সঙ্ঘের কাজকে সমস্ত জেলায় বিস্তারের চেষ্টা শুরু হয়েছিল। নবদ্বীপ নগরের পাশাপাশি কৃষ্ণনগরেও বেশ কয়েকটি শক্তিশালী শাখা গড়ে উঠেছিল। পরে ধুবুলিয়া, মায়াপুর, চাকদহ ও মুকুন্দপুরেও সঙ্ঘের শাখা বিস্তার লাভ করে। কৃষ্ণনগরের বিশিষ্টজনদের সঙ্গে শ্যামলালদার ছিল গভীর সম্পর্ক।

বিভিন্ন কার্যক্রমে শ্যামলালদা তাদের জেলার বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেতেন। সে সময় শ্যামলালদা প্রতিটি স্বয়ংসেবকের পরিবারে পৌঁছে যেতেন। ওই পরিবারের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন, প্রয়োজনে সহযোগিতাও করতেন। ফলে পরিবারের সকলের অত্যন্ত আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। মায়াপুরের একজন স্বয়ংসেবকের জন্ম থেকেই উপরের ঠোঁট কাটা ছিল। শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে ত্রুটি ঠিক করা সম্ভব এই বিশ্বাস শ্যামলালদা তার মধ্যে জাগালেন এবং চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করলেন। চিকিৎসার মাধ্যমে অল্পদিনের মধ্যেই তার ঠোঁট স্বাভাবিক হয়ে গেল। মায়াপুর ভাগীরথী ও জলঙ্গীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি দ্বীপ। আগে প্রায় প্রতি বছরই এখানে বন্যা হতো। এই অঞ্চলের মানুষের সেবা করার জন্য শ্যামলালদা চিড়ে-গুড় নিয়ে পৌঁছে যেতেন। কখনও কখনও কলকাতা থেকে হাতে তৈরি রুটি ও গুড় নিয়ে নৌকা সহযোগে এই অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে পৌঁছে যেতেন অসহায় মানুষের মুখে এক টুকরো খাবার তুলে দেবার জন্য। এই অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি গ্রামের মানুষের কাছেই শ্যামলালদা ছিলেন অত্যন্ত আপনজন।

এক শীতের সন্ধ্যা। শ্যামলালদা ও আমি বল্লালদিঘি গ্রামে এক স্বয়ংসেবকের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করে বামুন পুকুরে আমাদের বাড়িতে ফিরছি। শ্যামলালদা লক্ষ্য করলেন— রাস্তার পাশে এক বাড়ির বারান্দায়

সৈকত মিশ্রের সঙ্গে শ্যামলালদা।

কিছু কাঁথা-কাপড় জ্বলছে, পাশে একটি জ্বলন্ত ল্যাম্প। শ্যামলালদা বুঝতে পেরেছিলেন যে কাঁথা-কাপড়ের নীচে নিশ্চয়ই কোনো মানুষ আছে। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং একটানে কাঁথা-কাপড় উঠানে ফেলে দিলেন। দেখা গেল কাঁথা কাপড়ের নীচে এক মা তার শিশু সন্তানকে নিয়ে ঘুমাচ্ছিল, কখন গায়ের কাঁথায় আগুন ধরে গেছে বুঝতে পারেনি। সেদিন শ্যামলালদা শিশু সন্তান-সহ মাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় শ্যামলালদা কয়েকজন স্বয়ংসেবককে নিয়ে সত্যাগ্রহ করেন। ওই সময়কালে জেলের মধ্যে থাকা নক্‌শাল নেতাদের তিনি সহজেই আপন করে নিতে পেরেছিলেন। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহৃত হওয়ার পর তিনি স্থানান্তরিত হন। নদীয়া জেলার স্বয়ংসেবকদের মনে তিনি স্থায়ীভাবে জায়গা দখল করেছিলেন। স্থানান্তর হলেও তাঁর মনের মণিকোঠায় এই জেলার স্বয়ংসেবকদের স্থান পাকা হয়ে গিয়েছিল। কেশবভবনে থাকাকালীন যখন এই জেলার বা পূর্বপরিচিত স্বয়ংসেবকেরা কোনো কারণে কেশবভবনে গেছেন তখন তিনি তাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেটা আন্তরিকতার সঙ্গে দেখতেন। কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাকে কিছু না কিছু না খাইয়ে ছাড়তেন না। পরিচিত কাউকে পেলে তার কাছ থেকে তিনি তার পরিবারের কে কোথায় আছে সে সম্পর্ক খোঁজখবর নিতেন এবং দূরভাষ নম্বর সংগ্রহ করে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন।

শ্যামলালদা বেশি বয়সেও লোকাল ট্রেনে বা বাসে ভ্রমণ করতেন। একবার সুন্দরবন জেলায় তাঁর ভ্রমণ চলছিল। জেলা প্রচারকের সঙ্গে আমার কর্মক্ষেত্রে যাবেন বলে বারুইপুর স্টেশনে পৌঁছেছিলেন। ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। জেলা প্রচারক কোনোক্রমে ট্রেনে উঠলেও শ্যামলালদা ওই কমপার্টমেন্টে উঠতে পারেননি। তিনি পিছনের কোনো কম্পার্টমেন্টের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে চলতে শুরু করেছিলেন। জেলা প্রচারক তাঁকে দেখতে না পেয়ে পরের স্টেশনে নেমে পড়েন এবং বারুইপুর নিবাসে চলে যান তিনি ফিরে এসেছেন কিনা দেখার জন্য। সেই সময় মোবাইলের এত প্রচলন ছিল না। নিবাসে তাঁকে দেখতে না পেয়ে পরের ট্রেন ধরে জেলা প্রচারক আবার শ্রীনগরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। শ্যামলালদা মথুরাপুর স্টেশনে নেমে জিজ্ঞাসা করতে করতে কাশীনগরে আমার বাসায় পৌঁছে যান। জেলা প্রচারক খানিক পরে পৌঁছান।

বছর সাতেক আগে আমার পুত্র চাকুরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য MADE EASY নামে দিল্লির একটা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়। হঠাৎ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে সহপাঠীর সহায়তায় AIIMS-এ ভর্তি হয়। পরেরদিন আমি কেশব ভবন হয়ে বিমানে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিই। শ্যামলালদা দিল্লিতে থাকা তাঁর আত্মীয়দের ফোন নং আমার হাতে তুলে দেন এবং তাঁদেরও ফোন করে আমাকে সহযোগিতা করতে বলেন। যদিও তার প্রয়োজন হয়নি, কারণ করুণা প্রকাশজী আগেই এই সংবাদ পেয়ে দিল্লির বাঙ্গালি স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে যান তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার জন্য।

বছর দুয়েক আগে ভাইঝির বিয়েতে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। এলাকার সকল স্বয়ংসেবক তাঁর সাক্ষাৎ পেয়ে এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিল। আমরা পাঁচভাই সকলেই সঙ্ঘের সঙ্গে জুড়ে আছি, দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে চলেছি এবং সৎভাবে জীবন যাপন করছি, তার মূল প্রেরণা শ্যামলালদা। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে আমরা সকলেই শোকাহত। ঈশ্বরের কাছে তাঁর অমর আত্মার শান্তি কামনা করি।

(লেখক মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক)

সংস্কার ভারতীর কার্যকর্তাদের সঙ্গে কেশবজী।

নব ভারতের দধীচি

ইন্দ্র মোহন রাভা

আজ যাদের নিরন্তর সাধনা, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও বলিদানের ফলে দেশ জেগে উঠেছে এবং যারা দেশবাসীর সুখের জন্য নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জন দিয়ে কণ্টকাকীর্ণ পথ স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন, দেশের দধীচি স্বরূপ সেই সমস্ত অগণিত প্রচারকদের মধ্যে বরিষ্ঠতম বাঙ্গলায় সঙ্ঘ কাজের অন্যতম স্থপতি, বহু উত্থান-পতন-সংঘর্ষ প্রতিকুলতার সাক্ষী, হিন্দু সমাজ সংগঠনের অপ্রতিম যোদ্ধা কেশবরাও দীক্ষিত সম্প্রতি ইহলোক ত্যাগ করে স্বধামে গমন করেছেন এবং তার কয়েকদিন পরে লোকান্তরিত হয়েছেন তাঁর যোগ্যতম পার্ষদ শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দু সমাজ সংগঠনের মহৎ লক্ষ্য নিয়ে সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে বাঙ্গলায় এসে দশকের পর দশক কাটিয়েছেন। (৭২ বছর)। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার বায়ু, বাঙ্গলার ফলে পরিপুষ্টি লাভ করেছেন। বাংলা ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে একাত্ম করে নিয়ে বাঙ্গালি বনে গিয়েছেন। সত্যি তিনি বাঙ্গালি হয়ে গিয়েছিলেন। বাংলায় একটা প্রবাদ বাক্য আছে, 'শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে'। কেশবজী বাঙ্গলাকে ভালোবেসেছেন, সকলকে আপন করে নিয়েছেন, তাই বাঙ্গলার স্বয়ংসেবক, কার্যকর্তাদের শাসন করার অধিকার তিনি অর্জন করেছিলেন। তার মতো বিশাল ব্যক্তিত্বের শাসন ও সোহাগ লাভের সৌভাগ্য আমাদের সকলেরই হয়েছে।

১৯৭৫ সালে মালদহ জেলার চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ে ২৫ দিনের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ সমাপ্ত করে সবেমাত্র বাড়িতে ফিরেছি। বর্গের শারীরিক ধকল ও ক্লান্তি তখনও কাটেনি। পরের দিনই শুনলাম, দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে। জরুরি অবস্থা কী বুঝতে না বুঝতেই কদিন পরে শুনলাম সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আমি তখন হায়ার সেকেন্ডারির ছাত্র। একদিন ছাত্রাবাসে আমার রুমের দরজার সামনে হঠাৎ দেখলাম, ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত, সৌম্য দর্শন দু'জন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। তাঁদের আকস্মিক দর্শনে আমি কিছুটা হতচকিত ও অভিভূত হয়ে পড়লাম। একজন আমার পূর্ব পরিচিত, উত্তরবঙ্গের বরিষ্ঠ প্রচারক দেবব্রত সিংহ। দ্বিতীয়জনের পরিচয় জানতে পারলাম, তিনি কেশবজী। কেশবরাও দীক্ষিত। বাঙ্গলার সহ প্রান্ত প্রচারক। কিছু আগে পরে প্রান্ত প্রচারক বসন্তদাও (বসন্তরাও ভট্ট) তুফানগঞ্জে আমার শাখাতেই কার্যক্রমে এসেছিলেন। এন এন এম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ধীরেন বসুও সেই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দর্শনেই ভালো লাগা। মনে আছে, প্রাথমিক কথাবার্তার পর তিনি একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন, যেটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো পাওনা। তিনি সোজা বাঙ্গলায় বললেন, 'তোমাকে আমার চাই, তোমাকে প্রচারক বেরোতে হবে, পারবে তো?' তখন আমি একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। ছোটোবেলা থেকেই একজন মনীষীর ছবি আমাকে আকর্ষণ করত। তাঁর ছবি সেদিন আমার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল। সেটি ছিল, কন্যাকুমারীকাতে শিলাখণ্ডের উপর গৈরিক বসন পরিহিত, দণ্ডায়মান স্বামী বিবেকানন্দের ছবি। কেশবজীর এই অদ্ভুত কথা শুনে আমার কী হলো, হঠাৎ করে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো,— আমি তো গেরুয়া নিয়েই এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে অমলিন হাসিতে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

হায়ার সেকেন্ডারি ফাইনাল পরীক্ষার পর (১৯৭৮) দেবুদার হাত ধরে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে আড়াই মাস কালিম্পঙে বিস্তারক। তারপর, কোচবিহার শহরে বিদ্যার্থী বিস্তারক (এবিএন শীল কলেজের ছাত্র ১৯৭৮-৮০)। বিএ ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার পর প্রচারক হিসেবে সটান কলকাতায় (১৯৮০)। প্রচারক বর্গের পর আমার কর্মক্ষেত্র ঘোষিত হলো উত্তর কলকাতার সারদা নগর। প্রায় একই সময়ে বিভিন্ন জেলা থেকে আমরা প্রায় কুড়িজনের মতো তরুণ প্রচারক হিসেবে বেরিয়েছিলাম। কেশবজী ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। তিনি একাধারে শারীরিক, বৌদ্ধিক, গীত ও শঙ্খ বাদনে সিদ্ধহস্ত

একটি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কেশবজী।

ছিলেন। আমাদের সঙ্গে শাখার মাঠে দক্ষতার সঙ্গে কবাডিও খেলতেন। তাঁর কাছ থেকে বেশ কয়েকটি গানের সুর ঠিক করে নিয়েছিলাম।

সারদা নগরে টালাপল্লী এলাকায় কালীকৃষ্ণ ব্যানার্জি লেনে সঙ্ঘের একটি নিবাস আছে। আমি বেশিরভাগ সময় সেখানেই থাকতাম। সারদানগরের কার্যবাহ, সুশীলদা, প্রতাপদা, (প্রতাপ ব্যানার্জি) এবং টালাপল্লীর রঞ্জিত দাস (প্রয়াত) আমাকে নগরের বিভিন্ন শাখায় এবং কার্যকর্তাদের বাড়ি নিয়ে যেতেন পরিচয়ের জন্য।

একদিন শুনলাম, বরিষ্ঠ প্রচারক শ্যামলালদার বাড়ি এই নিবাসের খুব কাছাকাছি। শুনে আমি কিছুটা অবাক হলাম এবং আনন্দিতও হলাম। কয়েকদিন পর শ্যামলালদা আমাকে ২৬নং নিবাস থেকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। অভিজাত, বনেদি পরিবার। তাঁর দাদা ও বউদির সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বিশেষ করে বউদিকে একরকম নির্দেশই দিলেন যে, এর বাড়ি বহু দূরে, কোচবিহারে, প্রচারক বেরিয়েছে। এখানে বাবা-মা নেই। ও মাঝে মধ্যে বাড়িতে আসবে। ওকে জলখাবার, টিফিন দেবে, দুপুরে-রাতে খেতে বলবে। আমি তখন লজ্জায় পড়ে গেলাম। শ্যামলালদার ভাইঝি তখন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছে। তিনিও তখন ঘরেই ছিলেন।

ধবধবে ধুতি ও ফুল শার্টে শ্যামলালদা ছিলেন নিপাট বাঙ্গালি ভদ্রলোক। ধুতি পরতেন বাঙ্গালি স্টাইলে। উচ্চ শিক্ষিত, অভিজাত, বনেদি, ধ্রুপদী বাঙ্গালিয়ানার জীবন্ত প্রতিভূ। তিনি সংসারী নন, কিন্তু সংসারের খুঁটিনাটি তাঁর নখ দর্পণে। সংসারের আয়-ব্যয়, বাড়িঘর, সন্তানসন্ততির ভবিষ্যৎ, পারিবারিক সংস্কারের প্রতি তাঁর বিশেষ নজর ছিল। তাঁকে দেখলেই মনে হতো, স্বচ্ছতার প্রতিমূর্তি। তার কাছে স্বচ্ছতা, পরিচ্ছন্নতা ছিল ঈশ্বর লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ সোপান। স্বয়ংসেবক পরিবারের সঙ্গে শুধু সম্পর্ক রাখাটাই যথেষ্ট নয়, সেই পরিবারের একজন হয়ে যাওয়া এবং অভিভাবক হয়ে ওঠা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। আমার মতো অনেকেরই তিনি ছিলেন পরিবারের বড়ো দাদা, অভিভাবক স্বরূপ। কোচবিহারে এলেই তাঁর আবাসস্থল হতো হয় নিবাসে, নয় প্রবীণ স্বয়ংসেবক সুশীল বণিকের বাড়িতে। গত করোনা কালের প্রাক্কালে তিনি সুশীলদার বাড়িতে একটানা আট মাস ছিলেন। যেন বাড়ির বড়োদাদা বহুদিন বাইরে থেকে এই মাত্র ঘরে ফিরেছেন। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন কার্যকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ, ফোনালাপ চলত নিরন্তর। জরুরি অবস্থার সময় তিনি জনতা দলের হয়ে কাজ করেছিলেন। পরে তিনি যখন উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি বিভাগ প্রচারক হিসেবে আসেন, সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শিলিগুড়ি নিবাসের জন্য জমি কেনা এবং কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়িতে শিশু তীর্থ গড়ে তোলা তার অন্যতম অবদান।

গত জুন মাসে আমি সস্ত্রীক কলকাতায় গিয়ে কেশবজী ও শামলালদার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। অনেক কথা হয়েছিল। সেটাই ছিল আমাদের শেষ দেখা। বাঙ্গলায় সঙ্ঘ কাজের স্থপতি, সঙ্ঘ পরিবারের ভীষ্ম পিতামহ কেশবজীকে এবং সবার আপনজন শ্যামলালদাকে আমি অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি। □

সবাইকে নিয়ে শিকড়ে ফিরতে চান যুধাজিৎ

মানস রায়।। সিলিকন ভ্যালির প্রবাসী ভারতীয় যুধাজিৎ সেন মজুমদার সারা পৃথিবীতে এক সুপরিচিত নাম। কেরিয়ার ও নিজের পরিবার সামলেও তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে নিয়োজিত মেধাবী বাঙ্গালি যুবক-যুবতীদের বাঙ্গলা ও ভারতীয় সনাতন ধর্ম সংস্কৃতির অঙ্গনে একত্রিত করার উদ্দেশে নিবেদিত প্রাণ এই তরুণ তথ্যপ্রযুক্তিবিদ্।

আমেরিকাখ্যাত ইন্ডিয়া ডে প্যারেড এবং ফেস্টিভ্যাল অব গ্লোবের অন্যতম কর্ণধার যুধাজিৎ। এই প্যারেড ও ফেস্টিভ্যালে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের পরিচিতি উজ্জ্বল করার কৃতিত্বের সিংহভাগ যুধাজিতের প্রাপ্য। সানফ্রান্সিসকো বে এরিয়ার সর্ববৃহৎ হিন্দু মন্দির ফ্রিমন্ট টেম্পলে কালী মূর্তি (মা ভবতারিণী) প্রতিষ্ঠা ও নিত্য পূজা প্রবর্তনের নেতৃত্বেও ছিলেন তিনি। এই কালী মন্দির ঘিরে সেদেশের বাঙ্গালি সমাজে সৃষ্টি হয়েছে এক ধর্মীয়-সামাজিক জাগরণের। চিরাচরিত জংধরা তথাকথিত সেকুলার নির্জীব বাঙ্গালি পরিবেশের জাল কেটে উঠে এসেছে এক উচ্চশিক্ষিত যুবশক্তি যারা হিন্দুত্বের আদর্শে উজ্জীবিত, সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী স্বর। আমেরিকা, ভারত, বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গে--- যখনই হিন্দু সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও আচরণের উপর কোনও আঘাত এসেছে তখনই যুধাজিতের নেতৃত্বে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে সিলিকন ভ্যালির যুবসমাজ। কখনো সোশ্যাল মিডিয়ায়, কখনো ক্যালিফোর্নিয়ার রাস্তায় বা পার্কে মিলিত হয়ে এই প্রবাসী ভারতীয়রা আন্দোলনমুখী হয়েছেন।

CALIFORNIA LEGISLATURE

Assembly

CERTIFICATE OF RECOGNITION

On behalf of the California State Assembly,
I, Assemblymember Alex Lee,
on this 4th day of October 2022, do hereby recognize

Judhajit Senmazumdar

for his community work and with special appreciation for his dedicated efforts in our community promoting India's rich culture, heritage, and music.

Thank you for all that you do!

ALEX LEE
ASSEMBLYMEMBER, 25th DISTRICT

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র যুধাজিৎ সেন মজুমদার ছাত্রজীবন থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত এবং সঙ্ঘ শিক্ষার প্রয়োগ চালিয়ে যাচ্ছেন সুদূর আমেরিকাতেও। ধর্মীয় ও সামাজিক গণ্ডির বাইরে দলমতনির্বিশেষে মানুষের সেবায় নিয়োজিত যুধাজিৎ, বিশেষ করে বাঙ্গালির। কার ভিসা সমস্যা, কার পাসপোর্ট হারিয়েছে, কার কোভিডের সময় সাহায্য প্রয়োজন— প্রথমেই মানুষ যার খোঁজ করেন, তিনি হলেন যুধাজিৎ সেন মজুমদার।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির ইন্টারন্যাশনাল ডিপার্টমেন্টের আমেরিকার প্রতিনিধি যুধাজিৎ আমেরিকা-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী বাঙ্গালিদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও নরেন্দ্র মোদীর চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সহায়ক শক্তি হিসেবে সংগঠিত করেছেন। এই বাঙ্গালিরা বিভিন্ন সম্মাননীয় পেশায় যেমন অধ্যাপনা, তথ্যপ্রযুক্তি,চিকিৎসা, আইন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কর্মরত।

গত এক বছর ধরে যুধাজিৎ নিজস্ব পেশায় কৃতিত্ব বজায় রেখে ভারতীয় এবং বঙ্গ সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে আমেরিকার বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক জগতকে ঋদ্ধ করার যে অনলস প্রয়াস চালিয়েছেন তার স্বীকৃতিস্বরূপ গত ৪ অক্টোবর যুধাজিৎকে বিশেষ সম্মান জানানো হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার লেজিসলেচার অ্যাসেম্বলির পক্ষ থেকে। হাতে একটি মানপত্র তুলে দিয়ে এই বঙ্গসন্তানকে সম্মানিত করেছে ক্যালিফোর্নিয়া প্রশাসন। যুধাজিতের এই সম্মানে আনন্দিত ও উৎসাহিত ক্যালিফোর্নিয়ার বাঙ্গালি সমাজ।

যুধাজিৎ সুদূর ক্যালিফোর্নিয়ায় থেকেও একদল তরুণ-তরুণীকে জোটবদ্ধ করে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে তুলেছেন একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এই সংস্থার মাধ্যমে আর্ত-পীড়িতদের সেবাকাজ চালানো হয়। গত বছর পশ্চিমবঙ্গে পোস্টপোল ভায়োলেন্সে ভিটেমাটি হারানো বহু মানুষকে আর্থিক সাহায্য করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যুধাজিতের স্ত্রী অবর্ণাও একজন তথ্যপ্রযুক্তিবিদ্। তাঁদের কন্যা একজন প্রশংসিত শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পী।

মায়ের পুজোয় মেয়ের পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি।। হাওড়া উদয়নারায়ণপুর ব্লকের অন্তর্গত রাজাপুর বামুনপাড়া ভট্টাচার্য বাড়িতে ২৩৭ বছরের প্রতিষ্ঠিত দুর্গাপূজা চলে আসছে। এই পূজায় বেশ কয়েক বছর ধরে পঞ্চমী তিথিতে কন্যা পূজন অনুষ্ঠান হয়। এলাকার বারোজন অন্ত্যজবর্ণের কন্যাকে ভট্টাচার্য পরিবারের সদস্যরা বিশেষভাবে পূজা করে থাকেন। এই পরিবারের তাপস ভট্টাচার্যর কাছ থেকে জানা গেল এই কন্যাদের চয়ন করা হয় গ্রামের বা এলাকার পুরোহিত অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি হাওড়া ও হুগলী জেলায় ১২টি টোলের মার্গদর্শক, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সংবর্ধনা প্রাপ্ত এবং গ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট প্রবীণ নাগরিকের মাধ্যমে।

এবছর ৩০ সেপ্টেম্বর পঞ্চমী তিথিতে ৩ জন রাজমিস্ত্রি তাপস হাম্বির, অভিজিৎ মালিক, শ্রীকান্ত মালিকের মেয়ে, ২ জন মালবাহী ট্রলি ভ্যানচালক তপন দলুইয়ের মেয়ে, গ্রামের বিশিষ্ট প্রবীণ সমাজসেবী প্রশান্ত সাউয়ের নাতনি, এক গ্রামীণ হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের মেয়ে, ৩ জন কারখানা শ্রমিকের মেয়ে, এক মেডিসিন হকারের মেয়ে, মিস্টির দোকানের কারিগর গৌতম পোড়ের মেয়েকে কন্যাপূজায় শামিল করা হয়। এক পূজিতা কন্যার মা ও বাবার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল যে পুরোহিতের কাছ থেকে তাদের কাছে এই প্রস্তাব দেওয়ায় তারা বলেন, 'আমরা ইতস্তত করছিলাম, কিন্তু পুরোহিত আমাদের বলেন আমাদের শাস্ত্রে সকলের সমান অধিকার রয়েছে। পূজায় অংশগ্রহণের অধিকার সকলের।' পুরোহিত আরও জানান সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন ভাবে এখানকার সমাজে বিভেদ তৈরি করে সামাজিক সম্প্রীতি বিঘ্নিত করা হয়েছিল। এখন আমাদের সমাজে সম্প্রীতি রক্ষার কাজে এই পরিবারের তরুণরা এগিয়ে এসেছে।

'যুক্তিহীনে বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে'— কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিলে চলবে না। 'কারণ যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি হয়ে থাকে।' যে কোনো প্রকারে কার্য সিদ্ধি করাই সবকিছু নয়। দুর্গাপূজার পঞ্চমী তিথিতে এই পরিবারের বার্তা— 'সকলে এক সমাজের অঙ্গ, সকলের মধ্যে এক ও অভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।'

নতুন ইউনিকর্ন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভারত চীনের থেকে এগিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১৫ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমবার স্টার্টআপ ইন্ডিয়া প্রচারের কথা উল্লেখ করেছিলেন। 'স্টার্টআপ' শব্দটির সঙ্গে ভারতীয়রা আগে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু দেশের তরুণরা, তাঁদের উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগিয়ে নতুন পথে ভবিষ্যৎ গঠনে আগ্রণী হয়েছে, তাঁরা 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া'র মাধ্যমে একটি নতুন পথ পেয়েছে। স্টার্টআপ থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল, পরে তা ইউনিকর্নে (১ বিলিয়ন ডলার কোম্পানি) পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত হুরুন ইউনিকর্ন গ্লোবাল ইনডেক্স ২০২২ রিপোর্ট অনুসারে ২০২২ সালের জানুয়ারি ও জুলাই মাসের মধ্যে নতুন ইউনিকর্ন যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ভারত চীনকে অতিক্রম করে গিয়েছে। চীনকে বিশ্বের উৎপাদন শক্তি বলা হয়। মাত্র ছয় মাস সময়কালের মধ্যে ভারত থেকে ১৪টি স্টার্টআপ ইউনিকর্ন হয়েছে, যেখানে চীন থেকে শুধুমাত্র ১১টি স্টার্টআপ ইউনিকর্ন হতে পেরেছে। একই সময়ে ইউনিকর্নের মোট সংখ্যার নিরিখে, আমেরিকা ও চীনের পরে ভারত বিশ্বের তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

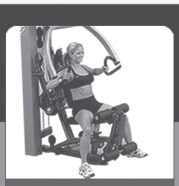

Fitness Wali Diwali
BODYLINE MEGA FESTIVE OFFER*
UPTO 50%OFF*
FREE GIFT Stylish Smart Watch MRP₹8,999*
FREE GIFT Google Assist Smart Speaker MRP₹5,999*
FREE GIFT Boombox Bluetooth Speaker MRP₹5,999*
*Terms & conditions apply.
#Gift value at MRP.
Easy EMI with Bajaj Finserv + Get Cashback voucher upto ₹3,000*
FREE GIFT Stainless Steel Table Clock MRP₹1,499*
Motorised Treadmill
Home Multi Gym
Recumbent Bike
Multi Bench
Massage Chair
Sports Accessories & Protien Supplements
Exchange Bonus: Get upto Extra 10% Off*
Assured Gifts with Purchase above ₹10,0007-
For Online Purchase Visit- www.bodylinesports.co.in
EMI@0%
14 D, Ballygunge Circular Road | Ph: 4064 8222
Hiland Park Mall | Ph: 4007 2071
City Centre 2 Mall, New Town | Ph: 4062 0065
Avani Riverside Mall, Howrah | Ph: 80176 68426
Benachity, Durgapur | Ph: 89182 32604
For Inquiry, Call:
98360 61000 / 82400 12075
BODY LINE
Inspiring Fitness
An ISO 9001:2015 Certified company
E-mail: bodylinesports@gmail.com
For complete gym-set-up for Corporates, Hotels, Clubs, Residential Complex, call 98360 62590

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ১৭।।

কলকাতায় এম এ পড়তে আসবেন মহানামব্রতজী। সেই অধ্যক্ষ মশাই তাঁকে প্রশংসাপত্র লিখে দিলেন— 'আমার সমস্ত অধ্যাপনা জীবনের একটি ছেলেকেই দেখলাম যে শুদ্ধ জ্ঞান লাভের জন্য অধ্যয়ন করেছে।' মহেন্দ্রজীও তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, 'ত্যাগীর বেশ পরিয়ে তোকে কলেজে পাঠানোর উদ্দেশ্য আজ পূর্ণ হলো।'

৫৯ নং মানিকতলা মেন রোডে মহাউদ্ধারণ মঠ। এখানে থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এম এ পড়া শুরু করলেন মহানামব্রতজী।

(ক্রমশ)